বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ.

চতুর্থ সেমেস্টার

ডি এস ই/DSE - ৪০৫
বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ
ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Prof. (Dr.) Tapati Chakrabarty,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক (ড.) সৌমিত্র বসু — প্রাক্তন অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক (ড.) নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. তুষার পটুয়া — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

এপ্রিল, ২০২৪

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার,

২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self-Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from **Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of the PG-BoS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self-Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self-Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

বাংলা

এম.এ.

চতুর্থ সেমেস্টার

পাঠক্রম

ডি এস ই/DSE - ৪০৫

(বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য)

পাঠ্য ও অনুশীলন :

পর্যায় গ্রন্থ ১ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

রবীন্দ্র-নাট্যপ্রযোজনা : পাঠ ও অনুশীলন

পর্যায় গ্রন্থ ২ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

রবীন্দ্র-গল্পের নাট্যরূপ

পর্যায় গ্রন্থ ৩ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

রবীন্দ্র-রচনাংশ থেকে দার্শনিক তাৎপর্য

পর্যায় গ্রন্থ ৪ (সময় : ৪ ঘণ্টা)

রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠান্তর

ডি এস ই/DSE - ৪০৫
(বিশেষপত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য)

সূচিপত্র

ডি এস ই/ DSE-৪০৫	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১	রবীন্দ্র-নাট্যপ্রযোজনা : পাঠ ও অনুশীলন	—	—
পর্যায় গ্রন্থ ২	রবীন্দ্র-গল্পের নাট্যরূপ	অধ্যাপক (ড.) সৌমিত্র বসু	১-২৭
পর্যায় গ্রন্থ ৩	রবীন্দ্র-রচনাংশ থেকে দার্শনিক তাৎপর্য	অধ্যাপক (ড.) নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮-২৮
পর্যায় গ্রন্থ ৪	রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠান্তর	ড. তুষার পটুয়া	২৯-৪০

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১

রবীন্দ্র-নাট্যপ্রযোজনা : পাঠ ও অনুশীলন

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ২

রবীন্দ্র-গল্পের নাট্যরূপ

একক-১

নাট্যরূপ

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.১.২.১ প্রস্তাবনা

৪০৫.১.২.১ : প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রগল্পের নাটকরূপ নিয়ে আলোচনা শুরু করতে গেলে প্রথমেই তিনটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা দরকার। এক, সংরূপগত দিক থেকে নাটক এবং ছোটগল্পের মধ্যে পার্থক্য কী। দুই, রবীন্দ্র ছোটগল্পের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কিনা যা নাট্যরূপের ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার বলে বিবেচিত হতে পারে এবং তিন, ছোটগল্প নামক সংরূপ থেকে নাটক নামক সংরূপে কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে যাওয়া সম্ভব। আমরা শুরুতে প্রথম প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কথা বলবার চেষ্টা করি।

খুব প্রাথমিক বিচারে সাহিত্যকে তিন রকমের সংরূপে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটিকে বলতে পারি বর্ণনামূলক সাহিত্য বা Narrative Literature, দ্বিতীয়টিকে বলতে পারি গীতিকাব্যিক সাহিত্য বা Lyrical Literature এবং তৃতীয়টির নাম দিতে পারি নাট্যসাহিত্য বা Dramatic Literature। এদের মধ্যে মাঝের সংরূপটি আমাদের আলোচনার মধ্যে পড়বে না, আমরা শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি যে গীতিকাব্যিক সাহিত্য কোনো একজন মানুষের মনের কথাকে প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজে হতে পারেন, অথবা তাঁর মনের গহনে লুকিয়ে থাকা কোনো আমিও হতে পারে। বর্ণনামূলক সাহিত্যে কোনো একজন কথক সাহিত্যটি বর্ণনা করেন। কথকের ধরন তিন রকমের হতে পারে। এক, কাহিনীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এমন কেউ আখ্যানটি বলছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার, সম্পত্তি সমর্পণ প্রভৃতি, দুই, কাহিনীর কোনো একটি চরিত্র ঘটনাটি বলছে, যেমন ঘাটের কথা, সম্পাদক অথবা বোষ্টমী। আর তিন, আখ্যানের চরিত্রেরা ভাগ করে আখ্যানটি শোনাচ্ছে। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা বেছে নেব 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসকে। নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিবরণ নয়, আমরা কাহিনীটি প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই। অর্থাৎ, জীবনে যেমন করে ঘটনা ঘটে, তারই প্রতিরূপ তৈরি করা হয় মঞ্চের ওপরে, নাটক যিনি লেখেন, তিনি সেই প্রতিরূপের উচ্চারণযোগ্য ভাষাটি নির্ধারণ করে দেন। নাটকেও বিবরণকারী থাকতে পারেন, কিন্তু সেখানে তিনি একটি নির্দিষ্ট চরিত্র হয়েই আসেন। এ দিক থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধরনের বর্ণনামূলক সাহিত্যের সঙ্গে তার অনেকটা মিল আছে।

তাহলে বর্ণনাকে অপ্রত্যক্ষতা থেকে প্রত্যক্ষতায় নিয়ে আসাই হল নাট্যরূপকারের কাজ। প্রত্যক্ষতা বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি, যা কিছু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের মনের মধ্যে প্রকাশ করে। আমরা মনে রাখি নাটকের চরম সিদ্ধি তার মঞ্চ উপস্থাপনায়, সেক্ষেত্রে কথাসাহিত্য পাঠের এই সুবিধে নাটকের দর্শক পাবেন না। নাটককে তাই এমন হতে হবে যাতে তা শুরু থেকেই তার দর্শকের আগ্রহকে ধরে রাখতে পারে, দর্শক যেন কোনোভাবেই অন্যমনস্ক না হয়ে যান।

মানুষকে টেনে রাখবার প্রধান কয়েকটি উপায় আছে। এক, কাহিনীর মধ্যে যদি তীব্র সংঘাত থাকে, তাহলে দর্শকের মন সেখান থেকে বিচলিত হতে পারে না। এই সংঘাতের তিনটি প্রকার আছে। এক, ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির সংঘাত। অর্থাৎ, দুজন মানুষের মধ্যে সংঘাত চলেছে, সেটা সংলাপ দিয়ে তৈরি হতে পারে, আচরণ দিয়ে তৈরি হতে পারে, এমন কি জীবনাদর্শ দিয়েও তৈরি হতে পারে। যেমন, ওই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে জ্যাঠামশাই আর হরিমোহনের কথা মনে পড়বে। হরিমোহন সম্পর্কে শ্রীবিলাস নিজেই বলছে, *তিনি তাঁহার বড়ো ভাইয়ের এমনি উল্টা প্রকৃতির যে, সে কথা লিখিতে গেলে গল্প সাজানো বলিয়া লোকে সন্দেহ করিবে।* এই বৈপরীত্য চরিত্রদের আকার প্রকার, আচরণ বা সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংঘর্ষের বিষয় হল, ব্যক্তির সঙ্গে কোনো বড় শক্তির দ্বন্দ্ব। যেমন এই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে প্রচলিত হিন্দু বিশ্বাসের সংঘাত বেধেছিল। আর তৃতীয় স্তরে আছে আত্মদ্বন্দ্ব। বলা বাহুল্য, এই তিন দ্বন্দ্বের মধ্যে কোনো জল অচল বিভাজন নেই। দুজন ব্যক্তির দ্বন্দ্বের পেছনে দুটি বড় প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, আবার আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যেও বাকি দুটি সংঘাতের ধরন মিশে যেতে পারে। নাটকের মধ্যপর্বে, অথবা বলা ভাল পুরো নাটক জুড়েই যেন নাট্যদ্বন্দ্ব বজায় থাকে তা দেখতে হবে নাটককারকে। আসর নাটকের পরিসমাপ্তিটিও যেন নাট্যের ভাষায়

ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠতে পারে। পোস্টমাস্টার গল্পের কথাই যদি ধরি, গল্পের শেষে কথকের মুখে যে বিবরণ রয়েছে, নাটকের পক্ষে তা প্রয়োজনীয় নয় বলেই আমার বিশ্বাস। এমনটা হতে পারে, পোস্টমাস্টার চলে যায়, রতন একা চুপ করে বসে থাকে, হয়তো একটু কাঁদে, তার মধ্যে পর্দা পড়ে। এই সমাপ্তি আরো নানা ভাবে তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু নাটকীয়তার দাবিটি অতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

সবশেষে যে জরুরি কথাটি বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পের নাটকরূপ আমরা কেন করব? তা তো সেগুলি নাটককারকেই তৈরি করে নিতে হবে, যেমন তৈরি করে নিতে হবে পোস্টমাস্টার এবং রতনের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, যা রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র একটি দুটি ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। এই বিস্তারে যাবার সময় তাঁকে দুটি কথা মনে রাখতে হবে। এক, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে যে মেজাজ তৈরি করেছেন, তাঁর সংলাপের যা ধরন, তার সঙ্গে যেন কোনো বিরোধিতা তৈরি না হয়। আর দুই, অংশটি যেন যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে, তা যেন দর্শকের আগ্রহের যোগ্য উপাদানে পূর্ণ হয়।

পোস্টমাস্টার গল্পের থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্য গল্পের দিকে তাকালে নাট্যরূপের আরো বড় একটি সমস্যা আমাদের সামনে আসবে। একেবারেই পূর্ব অপরিকল্পিতভাবে আমরা বেছে নিলাম রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি গল্পের সূচনা অংশ— রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা। দেখা যাবে, এই গল্প শুরু হচ্ছে একটি বিবরণ দিয়ে। বেশ খানিকটা এমন বিবরণ, যাকে পঞ্চেন্দ্রিয় বিশেষ করে দৃশ্য এবং শ্রাব্য মাধ্যমে প্রকাশ করা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে এই তথ্যগুলিকে আকার দেবার জন্যে নাটককার হয়তো কোনো কল্পিত দৃশ্য তৈরি করতে পারেন, যদিও তাঁকে মনে রাখতে হবে, সে দৃশ্য যেন কোনোভাবে মূল আখ্যানের মেজাজকে নষ্ট না করে দেয়।

এবারে আর একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। বর্ণনামূলক সাহিত্যের সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের একটি প্রধান তফাৎ হল, বর্ণনামূলক সাহিত্যে অনবরত স্থান এবং কালের পরিবর্তন ঘটানো যায়, কিন্তু নাটকে তা সম্ভব নয়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করি। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের একটি অংশকে সামনে রাখা যাক। *গেলাম লীলানন্দ স্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।* দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু দিনের, এবং বেশ কিছু স্থানের বৃত্তান্ত এখানে সংহত করে রাখা হয়েছে। পড়তে পড়তে আমাদের চোখে নদী, মাঠ, মুদির দোকানে রাত্রি কাটানোর ছবিগুলি দ্রুতবেগে সামনে দিয়ে বয়ে যেতে পারে। চলচ্চিত্রের ভাষায় এই দ্রুতগতির বর্ণনাকে ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু নাটকে তা কঠিন, হয়তো অসম্ভবও বলা যেতে পারে।

তার কারণ, নাট্য যতই যন্ত্রনির্ভর হোক না কেন, তাকে স্থান বা কালের পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে কিছুটা আয়োজন করতে হয়। সাহিত্যে আমরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নদী মাঠ বা মুদির দোকান মনের চোখে দেখতে পাই, চলচ্চিত্রে পলকের মধ্যে সত্যিকারের নদী মাঠ বা মুদির দোকান দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু নাটকে যা দেখানো হচ্ছে তার সত্যি নদী মাঠ দোকান বা তাদের হুবহু প্রতিরূপ নয়, দর্শকের মনে বিশ্বাস করানোর জন্যে সময় দিতে হয়, এবং তাদের পলকের মধ্যে পালটে ফেলা যায় না। খুব সহজ অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যেতে পারে, নাটকের একটি দৃশ্যকে বেশ কিছুক্ষণ অবিচলিত থাকতে হয়, প্রতি সেকেন্ডে আলো নিভিয়ে বা পর্দা ফেলে দৃশ্য পরিবর্তন সেখানে সম্ভব নয়, দর্শকের তা ভালও লাগে না। সুতরাং, যে কোনো কথাসাহিত্যের

নাটকরূপ দিতে গিয়ে মনে রাখতে হয়, দৃশ্যগুলিকে খানিকটা স্থায়িত্ব দিতে হবে, তা না হলে নাটক নষ্ট হয়ে যাবে। এই সূত্রেই বলি, কথাসাহিত্য মুহূর্তের মধ্যে এক সময় থেকে অন্য সময়ে চলে যেতে পারে। নাটকে কিন্তু স্থানের মত সময়কেও কিছুক্ষণের জন্যে আটকে রেখে দিতে হবে। অর্থাৎ, যে সময়ে নাটকের কোনো দৃশ্য শুরু হল, এবং শেষ হল, সেই সময়টুকুর মধ্যে এমন কিছু ঘটতে পারবে না যা সময়ের শর্তকে লঙ্ঘন করছে। কথাসাহিত্যের মত নাটকের পটভূমি সঞ্চরণশীল হতে পারে না, নাট্যরূপ দেবার সময় সেই কথাগুলি মাথায় রাখতে হবে। এই স্থায়িত্ব দেবার জন্যে চরিত্ররা পুরনো কথা বলতে পারে, কথাপ্রসঙ্গে নানা স্থানের কথা চলে আসতে পারে। কিন্তু সেই সব খবর বা তথ্যগুলো যেন আসে খুব স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, যেন কখনো না মনে হয়, এই তথ্যগুলো দেবার জন্যেই জোর করে দেওয়া হয়েছে, পরিস্থিতির সঙ্গে তারা মিলছে না।

কেমন করে শুরু হবে নাটক? সাধারণভাবে নিয়ম হল, শুরু থেকেই যেন কী ঘটনা ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে একটা কৌতূহল বা আগ্রহ তৈরি হতে পারে। এই উৎকণ্ঠা যে কোনো সাহিত্যেই থাকা সম্ভব, নাটকে তা হয়তো আরো বেশি মাত্রা দাবি করে। একেবারে শুরু থেকেই তাকে টান টান রাখতে হবে, কথাসাহিত্যের তুলনায় বেশি করে। তার কারণ আছে। পাঠক তাঁর ইচ্ছেমত সময় এবং মর্জি অনুযায়ী কোনো গল্প বা উপন্যাস পড়তে পারেন, পড়তে পড়তে ইচ্ছেমত বই বন্ধ করে রাখতে পারেন পরে কোনো সময়ে পড়বেন বলে, এমন কি কোনো একটি অংশ তিনি দুবার বা তিনবার করেও পড়তে পারেন। নাটক নিশ্চয় সেইভাবে পড়া যায়, কিন্তু যদি নাট্যের উপভোগ এই সব কটি ইন্দ্রিয়কেই ব্যবহার করতে পারে, যদিও, সাধারণত আমরা যে সব নাটক দেখি, তারা চোখ আর কান এই দুই ইন্দ্রিয়ের বাইরে অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদন রাখবার জন্যে তৈরি হয় না। ফলে বলা যেতে পারে, নাটক যিনি লেখেন, তিনি একই সঙ্গে দেখা এবং শোনার উপযোগী করেই তাঁর সাহিত্যকে তৈরি করেন। বর্ণনামূলক সাহিত্য বা গল্প আমরা পড়ি, আর নাট্যে আমরা দেখি, আর সেই দেখা এবং শোনার ছকটা তৈরি করে দেওয়া হল নাটককারের কাজ। নাট্যে আমরা পাই অজস্র ক্রিয়ার সমাবেশ, এবং যা কিছু দৃশ্য বা শ্রুতিগ্রাহ্য নয়, এবং যা কিছুকে ক্রিয়া বহন করে আমাদের কাছে নিয়ে আসছে না, নাটকে তাদের কোনো জায়গা নেই। কথাসাহিত্যে এমন বেশ কিছু অংশ থাকতে পারে— যেমন ধরা যাক, *এক ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী। সুয়ো রাণী আর দুয়ো রাণী। রাজা সুয়োরাণীকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু দুয়োরাণীকে সহ্য করতে পারেন না*। লক্ষ করতে বলব, এই বিবরণের প্রায় কোনো কিছুই ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসছে না, ফলে একে নিয়ে নাটক লিখতে গেলে তাকে ক্রিয়ায় প্রকাশযোগ্য আকার দিতে হবে, এবং সে কাজ করতে গিয়ে নাটককারকে মূল রচনা থেকে খানিকটা সরে যাবার ঝুঁকি নিতে হবে। আমরা ফিরে আসি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে।

যে কোনো বিবরণে দুটি অংশ থাকতে পারে। এক, ঘটনা, সংলাপ, আর দুই, মতামত, পটভূমি প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। উদাহরণ হিসেবে বেছে নেওয়া যাক পোস্টমাস্টার গল্পের একটি ছোট অংশ। *সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালাইয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন, 'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না— বলিত "কী গা বাবু, কেন ডাকছ।''*

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে— হেঁশেলের—

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলর কাজ পরে হবে এখন— একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?''

এই ছোট্ট অংশটিতে আমরা নাটকরূপ সম্ভাবনার তিনটি স্তরকে লক্ষ করতে পারছি। প্রথম স্তরে শুধু বিবরণ, সে বিবরণ চলচ্চিত্রের পক্ষে খুবই লোভনীয় হতে পারে, কিন্তু মঞ্চে তাকে ফুটিয়ে তোলা কঠিন। এ বিষয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব। দ্বিতীয় স্তরে দুজনের কথোপকথন। লক্ষ করে দেখতে বলব, এখানে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সংলাপগুলি একেবারে কথোপকথনের ভাষাতেই লিখেছেন, তার মধ্যে কোনো শিল্পিত অতিরেক রাখেননি। তৃতীয় অংশটিতে চরিত্রের আচরণ, গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ, এটি বর্ণনা, কিন্তু মঞ্চে দেখাতে অসুবিধে নেই।

উদ্ধৃতি বড় হয়ে যাবার ভয়ে পরের অংশটি আমরা বাদ দিয়েছি, কিন্তু নাট্যরূপের সমস্যা বোঝবার জন্যে অংশটি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে রতন এবং পোস্টমাস্টার তাঁদের স্মৃতি থেকে উঠে আসা নানা গল্প করতেন। গল্পগুলি রবীন্দ্রনাথ প্রায় বলেননি, সামান্য এক আধটুকু আভাস ছাড়া। অথচ, এই গল্প করা ব্যাপারটি কাহিনীর পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এই দুই সর্বার্থেই অসম মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে, এবং উঠছে তা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনস্মৃতির ওপর ভর করে। পোস্টমাস্টার যে ফস করে রতনকে তার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করেন, তার থেকে বুঝতে পারা যায়, এই নির্জন প্রবাসে তাঁর নিজের মায়ের কথা মনে পড়ছে। এই ইঙ্গিতটুকুর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুজনের স্মৃতির সারূপ্য দেখিয়ে দেন, নাটক রূপ দিতে এলে কিন্তু তা হয়তো ছোটগল্পের মত সহজে হবে না।

বর্ণনামূলক সাহিত্যের যে অংশটি নাটকের দাবির সঙ্গে মিলে যায়, সেখানে আপাতভাবে কোনো সমস্যা নেই, যদিও তাই নিয়েও দু একটি কথা বলতে হবে আমাদের। কিন্তু প্রথমে যে অংশটি, যেখানে পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে নাটককার তাঁর লেখায় ব্যবহার করবেন কী করে? এখানে আমরা সাধারণভাবে নাটক আর নাট্য, অর্থাৎ লিখিত নাটক আর প্রযোজনা ভাবনার পার্থক্যের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। অন্যান্য সাহিত্যের সংরূপের সঙ্গে নাটকের আরো একটা বড় ফারাক রয়েছে। উপন্যাস গল্প বা কবিতা, অর্থাৎ বর্ণনামূলক এবং গীতিকাব্যিক সাহিত্য আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, আমরা তা পড়বার জন্যে যাই, এবং লেখক যা লিখেছেন, হুবহু তাই পড়ি, তাকে অন্য কোনো শিল্পরূপে পালটে দেবার দরকার হয় না। কিন্তু লিখিত নাটক আর নাট্য বা প্রযোজনার মধ্যে সংরূপের একটা ব্যবধান আছে। নাটক আর নাট্য তো এক নয়। নাটক হল সাহিত্যের একটি সংরূপ, তার উপাদান কেবলমাত্র উচ্চারণযোগ্য ভাষা, সে ভাষা কখনো লিখিত আকারে, কখনো বা মৌখিক ভাবে প্রকাশিত হয়। নাট্যে কিন্তু উচ্চারণযোগ্য শব্দ একটি উপাদান মাত্র, তার বাইরে আরো অনেকগুলো উপাদান দিয়ে সাজানো হয় প্রযোজনাকে, তাদের অনেকের সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক না থাকতেই পারে। প্রখ্যাত পোলিশ নাট্যতাত্ত্বিক তাদিউস কাউজান দেখিয়েছেন, মোট তেরোটি উপাদানের সংযোগে নাটক নাট্য বা প্রযোজনা হয়ে ওঠে। এগুলি হল word, tone, mime, gesture, movement, make-up, hair-style,

costume, accesory, decor, lighting, music and sound effects. এদের সমবায়ে বা রসায়নেই একটি নাট্য রসসঞ্চার করতে পারে। বলে রাখা দরকার, আরো কোনো কোনো উপাদানের কথা বলেছেন আরো কোনো কোনো নাট্যতাত্ত্বিক, কিন্তু সে বিষয়ে আলোচনা আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হবে। নিশ্চয় বুঝতে পারা যাচ্ছে, বেশ কয়েকটি উপাদানকে সাহিত্যের অন্তর্গত করা সম্ভব নয়। যিনি নাট্যরূপ দেবেন, তাঁকে মনে রাখতে হবে, তাঁর রচিত সাহিত্য অংশটি আরো উপাদানের সংযোগের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাঁর কাজ তার ভিতটুকু তৈরি করে রাখা।

পোস্টমাস্টার গল্পের যেটুকু উদ্ধৃত করেছি, তার প্রথম অংশটি তো মঞ্চবর্ণনার মধ্যে পড়ে, এবং মঞ্চ বর্ণনার অংশটি হুবহু গল্পের মত সাজানো কঠিন। গ্রামের গোয়াল ঘর থেকে ধূম কুণ্ডলায়িত হয়ে ওঠা, গাছের কম্পন দেখলে কবিহৃদয়ের কেঁপে ওঠা ইত্যাদি মঞ্চের ভাষায় দেখানো সম্ভব নয়, নির্দেশক সেক্ষেত্রে আলো, শব্দব্যবহার এবং অন্যান্য উপাদান দিয়ে পরিবেশটি তৈরি করে নেবেন, নাটককার তার নির্দেশটুকু দিয়ে রাখলেই যথেষ্ট। এর বাইরে, রবীন্দ্রনাথ খুব সামান্য একটি দুটি সংলাপের ওপর ভর করে পরিবেশ এবং দুটি চরিত্রের মানসিক অবস্থার আভাস দিয়েছেন, নাটক নিশ্চিতভাবে আরো কিছু সংলাপ এবং আদান প্রদান দাবি করবে।

এই জন্যে যে সেই বিশেষ গল্পটাই আমার ভাল লেগেছে? গল্পটাই ভাল লাগবে কেন? তার ভেতর দিয়ে নিশ্চয় আমি গল্পকে পার হয়ে যাওয়া, বহু মানুষের অনুভবযোগ্য কোনো তাৎপর্যের সন্ধান পেয়েছি। গল্পটাই যে কারণে আমার ভাল লেগেছে, সেই কারণটি যেন আমার নাট্যরূপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে।

রবীন্দ্রগল্পের নাটকরূপ কেমন হতে পারে, তার একটি উদাহরণ আমরা সামনে রাখতে চাইছি। বলা বাহুল্য, এটি চূড়ান্ত কোনো উদাহরণ নয়, নিঃসন্দেহে এই গল্পের আরো ভাল নাট্যরূপ রচনা করা সম্ভব, কিন্তু উদাহরণটি সামনে রাখলে মূল কাহিনীকে কেমন করে নাটকায়িত করা যায়, তার একটা হদিশ হয়তো ছাত্রদের পক্ষে পাওয়া সহজ হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গল্পটার নাম সম্পাদক, গল্পগুচ্ছের মধ্যে পাওয়া যাবে। মূল গল্প এবং নাট্যরূপকে পাশাপাশি রেখে দেখলে হয়তো রবীন্দ্র-ছোটগল্পের নাট্যরূপ বিষয়টি সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পর্যায় গ্রন্থ : ২

রবীন্দ্র-গল্পের নাট্যরূপ

একক-২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল গল্প — সম্পাদক

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.১.১.১ সম্পাদক

৪০৫.১.১.১ : সম্পাদক

আমার স্ত্রী বর্তমানে প্রভা সম্পর্কে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখিয়া, তাহার আধো আধো কথা শুনিয়া এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভালো লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে একদিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দুহিতাকে দ্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্তব্য এটা আমি বেশি চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্তব্য এইটে সে বেশি অনুভব করিয়াছিল, আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গিন্নিপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল ঐটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম যতই আমি অকর্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভালো; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে, যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মতো এতবড়ো পুতুল সে ইতিপূর্বে কখনো পায় নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় শুয়াইয়া সে সমস্ত দিন বড়ো আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ প্রথমভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃত্বকে কিঞ্চিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক— আমার এত টাকা কোথায়। মেয়েকে তো সাধ্যমত লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কী দশা হইবে।

উপার্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্মেন্ট আপিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাও নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মূলেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোনো কাজই হয় না, কিন্তু ফুঁ দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভালো। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোনো কাজেই যে-হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভালো বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভালো বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া এমনি বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিন্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহসহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, ‘‘বাবা, নাইতে যাবে না?’’

আমি হুংকার দিয়া উঠিলাম, ‘‘এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিস নে।’’

বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুৎকারে নির্বাপিত প্রদীপের মতো অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন সে অভিমানবিস্ফারিত-হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষুক সুর করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপার্শ্বেই আমার ঘর হওয়াতে যখন কোনো নিরীহ পান্থ জানালার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহান্নম নামক একটা অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি। হায়, কেহই বুঝিত না, আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি।

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না। এদিকে প্রভার যোগ্য পাত্রগুলি অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম। দিনকতক এমনি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মতো দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরগ্রামের পার্শ্বে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্বে কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মুচলেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ববর্তী খুনি লাঠিয়ালদের স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকূল পূর্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভালো। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম। মুখ সর্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ করিয়া এক-একটা মর্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম; আর সমস্ত জাহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মতো বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড়ো আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোনো কথা ঢাকিয়া বলিত না। এমনি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলা পর্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এইজন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাভ্যাসবশত এমনি মজা করিয়া এত কূটকৌশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত না আমার কথার মর্মটা কী।

তাহার ফল হইল এই, জিত হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ, যথার্থ ভালো জিনিসকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে, মনুবংশীয়ো হনুবংশীয়দিগকে বিদ্রূপ করিয়া কখনো তেমন কৃতকার্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর করেন না। সভাস্থলেও আমার কোনো সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন-কি, আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

মন এমনি নিরুৎসাহ হইয়া গেল, মাথা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোনো সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভালো সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হউক, ভাষার বাহাদুরি আছে। অর্থাৎ গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশজনের কাছে ঐ এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মতো ছিল। সন্ধ্যাবেলায় নিতান্ত পীড়িতচিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতেছিলাম। পাখিরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম পাখিদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং সুরুচি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলই ভাবিতেছি, কী উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বুঝিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেইরকম ভাবের একটা মুখের মতো জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না। এমন সময় সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইলাম এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্‌বেজিত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহূর্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়াছিল, ''বাবা''। কোনো উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পর ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিমীলিত; দিনশেষের ঝরিয়া-পড়া ফুলের মতো পড়িয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শির দপ দপ করিতেছে।

বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোনো কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোনো জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এত সুখ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।

বৈশাখ ১৩০০

একক-২

রবীন্দ্র-গল্পের নাট্যরূপ — সম্পাদক

[মঞ্চের নেপথ্যে তুমুল হট্টগোল চিৎকারের আওয়াজ। আলো জ্বললে দেখা গেল বেশ কিছু লোক, একে অপরের দিকে তেড়ে যাচ্ছে, কিছু একটা বিদ্রূপ বা গালমন্দ করে ফিরে আসছে। বিজয়ীদের অট্টহাসি, বিরুদ্ধ পক্ষের চিৎকার যেন কান ফাটিয়ে দেবে। সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে অনুকূল ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। বসে পড়ে। হট্টগোল স্তিমিত হয়ে যায়। মঞ্চ ফাঁকা হয়ে গেলে শোনা যায় বিকেলবেলার পাখির ডাক। অনুকূল একটা বেদির ওপর শুয়ে পড়ে। প্রভা ঢোকে। ধীরে ধীরে অনুকূলের কাছে আসে। ইতস্তত করে মাথায় হাত রাখে। অনুকূল তাকালে ভয়ে হাত সরিয়ে নেয়। তারপর দ্রুত ছুটে চলে যায়। অনুকূল দর্শকদের বলছে—]

অনুকূল ।। আমার স্ত্রী বর্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। তখন প্রভার চেয়ে প্রভার মাকে নিয়ে কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম। তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখে, তার আধো আধো কথা শুনে আর আদরটুকু নিয়েই তৃপ্ত থাকতাম। যতক্ষণ ভাল লাগত নাড়াচাড়া করতাম, কান্না আরম্ভ করলেই তার মায়ের কোলে সমর্পণ করে অব্যাহতি নিতাম। অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল।

[বলতে বলতে এক কোণে গিয়ে মাথায় হাত রেখে বসে পড়ে। প্রভা প্রবেশ করে।]

প্রভা ।। বাবারে বাবারে বাবা! তুমি দেখছি পাগল করে দেবে আমাকে। এত বেলা হল এখনো গালে হাত দিয়ে বসে আছ? যাও, নাইতে যাও। যাও বলছি। কী হল, কী দেখছ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে?

অনুকূল ।। সে তোকে বলা যাবে না। দেখি, আয় তো, একবার কাছটিতে আয়।

প্রভা ।। কেন?

অনুকূল ।। আয় না।

[প্রভা সামনে এসে দাঁড়ায়। অনুকূল বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে।]

প্রভা ।। হয়েছে হয়েছে। মেয়ে তোমার পালাচ্ছে না। এখন নাইতে যাও তো। আর কতক্ষণ ভাত কোলে করে বসে থাকব?

অনুকূল ।। তুই এ সব কথা শিখলি কোথ্থেকে রে?

প্রভা ।। ও মা, অবাক কাণ্ড! এর আবার শেখবার কী আছে? মানুষ কথা বলা শিখবে না? ওঠো, ওঠো, যাও, নাইতে যাও। যাও।

[সামনের দিকে এগিয়ে আসে অনুকূল।]

অনুকূল ।। ছ বছর বয়েস থেকেই সে গিন্নিপনা আরম্ভ করেছিল। হুবহু যেন তার মা। আমি মনে মনে হেসে তার হাতে নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ করলাম। এই দেখো দেখি কী বিপদ। চাদরখানা যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি নে। এই তো এইখানেই রেখেছিলুম।

প্রভা ।। কী হল বাবা, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছ যে? হয়েছে কী?

অনুকূল ।। আরে আমার চাদরটা। এই খাটের ওপর রাখলাম, বেরোবার সময় তুলে নেব। এখন দেখছি নেই। কে যে আমার জিনিসপত্তর সব নিয়ে নেয়।

প্রভা ।। কে আবার নেবে? এ বাড়িতে আমি ছাড়া আর আছেটা কে বলো তো!

অনুকূল ।। মানে?

প্রভা ।। ওই চাদরটা নিয়েছি আমি।

অনুকূল ।। তুই? কেন?

প্রভা ।। তার কারণ কোনো ভদ্রলোকের সমাজে ওই চাদর নিয়ে যাওয়া যায় না তাই। ওটা আমি কাচতে দিয়েছি।

অনুকূল ।। কী সর্বনাশ, তাহলে এখন উপায়? চাদর ছাড়া কী করে বেরোব?

প্রভা ।। উপায় এই যে, আমার হাতে। তোমার জন্যে চাদর কেচে পাট করে এনেছি।

অনুকূল ।। ওঃ, যাক, বাঁচালি।

প্রভা ।। আমি না থাকলে তোমার যে কী দশা হবে বাবা, তাই শুধু মাঝে মাঝে ভাবি।

[গজগজ করতে করতে প্রভা চলে যায়। সামনের মঞ্চে এগিয়ে আসে অনুকূল।]

অনুকূল ।। মেয়ের ওই শেষ কথাটা আমার মাথায় একটা অন্য ভাবনা ঢুকিয়ে দিলে। ওই যে, আমি না থাকলে তোমার যে কী দশা হবে। সত্যিই তো! প্রভাকে তো এবার বিদায় দিতে হবে আমার সংসার থেকে। বুক যতই টনটন করে উঠুক, এ তো আমার দায়। ভাবনাটায় হাওয়া দিল আমার ছোটবেলার বন্ধু মণিশঙ্কর।

[হাতে দাবার ছক আর ঘুঁটি নিয়ে মণিশঙ্কর ঢোকে, বসো, বসো।]

মণিশঙ্কর ।। তোমার কি হয়েছে বলো তো?

অনুকূল ।। কী?

মণিশঙ্কর ।। আমি তো সেইটাই জিগ্যেস করছি, জমিদার মশাইয়ের অসুখ, দুটো দিন মোসাহেবি থেকে ছুটি পেয়ে ভাবলুম সন্ধেবেলা তোমার সঙ্গে একটু খোশগল্প করে আসি, তা তোমার যেন কোনো গা-ই নেই।

অনুকূল ।। না না, এই তো।

[অনুকূল তাড়াতাড়ি বসতে যায়, মণিশঙ্কর উঠে তার কাছে এসে দাঁড়ায়।]

মণিশঙ্কর ।। থাক, ভদ্রতার প্রয়োজন নেই। বরং ভাবনার কারণটা শুনি।

অনুকূল ।। ভাবনা আর কী—

মণিশঙ্কর ।। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভাবছ!

অনুকূল ।। তুমি কেমন করে বুঝলে?

মণিশঙ্কর ।। বাঙালির সংসারে মেয়ে বড় হচ্ছে, তাও আবার মা-মরা মেয়ে, বাপের আর কী চিন্তা থাকতে পারে বল তো? তোমার গৃহিণীটি যদি থাকতেন তাহলে অনেক আগেই এ চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে তবে ছাড়তেন।

অনুকূল ।। তবে পাত্র দেখা শুরু করতে বলছ?

মণিশঙ্কর ।। তার আগে কোম্পানির নোটের হিসেবটা সেরে ফেল।

অনুকূল ।। কোম্পানির নোট?

মণিশঙ্কর ।। বিয়েতে খরচা নেই? সারাটা জীবন তো গায়ে ফুঁ লাগিয়ে ঘুরে বেড়ালে। বলি সিন্দুকে আছে কিছু?

অনুকূল ।। সেটাই তো মণিশঙ্কর, কিচ্ছু নেই। কিছু যে রাখতে হয় এই কথাটাই তো বলে দেয়নি কেউ এতদিন।

মণিশঙ্কর ।। বাপ পিতামোর সম্পত্তি যা ছিল তাই দিয়ে দিব্য চালিয়েছ এতদিন। কিন্তু মেয়ের বিয়ে তো অত সহজে পার করতে পারবে না হে অনুকূলচন্দ্র। কিছু টাকাপয়সা তো তোমাকে জমাতেই হবে।

অনুকূল ।। টাকাপয়সা? মানে—

মণিশঙ্কর ।। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছ, দেখতে শুনতে ভাল, ও মুক্তামালাটিকে কোনো বাঁদরের গলায় যদি দিতে না চাও তো পয়সা জমাবার উপায় দেখো।

অনুকূল ।। উপায়! কী উপায় করব মণিশঙ্কর, কোথা থেকেই বা করব। সরকারি চাকরির বয়েস গেছে, অন্য কোনো আপিসে প্রবেশ করবারও ক্ষমতা নেই। এখন নতুন করে কোথায় গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াব বলতে পার? আচ্ছা, তোমার ওই জমিদারমশাইয়ের মোসাহেব দলে আমাকেও ভর্তি করে নাও না!

[মণিশঙ্কর হো হো করে হেসে ওঠে।]

কী হল, হাসছে যে?

মণিশঙ্কর ।। তোমার কী ধারণা, মোসাহেবিটা খুব সহজ কাজ? সব সময় চোখ বুজে একটা মানুষের সব কথায় সায় দিয়ে যাওয়া। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা সব বিসর্জন দিয়ে। আর, তার মর্জির সঙ্গে মেলাতে না পারলেই অপমান সহ্য করা। সে যে কী অপমান!

অনুকূল ।। আমি তা বলিনি। কোনো কাজই সহজ নয় সে আমি জানি। তা মোসাহেবিও না হয় শক্ত কাজই হল। এই বয়সে সহজ কাজের বদলে কে আমাকে অর্থ জোগাবে বলো তো?

মণিশঙ্কর ।। দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা মতলব মাথায় এসেছে।

অনুকূল ।। মতলব?

মণিশঙ্কর ।। তোমার ছড়া লেখার অভ্যাস ছিল না এককালে? সেই যে, ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাইকে ব্যঙ্গ করে একটা ছড়া লিখেছিলে? বেত খেয়েছিলে, কিন্তু প্রশংসাও কম পাওনি।

অনুকূল ।। এতদিন বাদে আবার সে সব কথা কেন? আমাকে দিয়ে এই বয়েসে ছড়া লেখাতে চাও নাকি? না না, শব্দে শব্দে মিল ঘটাতে হবে, অভ্যেস চলে গেছে, সে ভারি হাঙ্গামা। আর তাছাড়া—

মণিশঙ্কর ।। ছড়া নয় হে, নাটক।

অনুকূল ।। নাটক? মানে?

মণিশঙ্কর ।। মানে—থিয়েটার।

[সামনের মঞ্চে এগিয়ে আসে অনুকূল, পেছনের অন্ধকারে মঞ্চ বদলাবার কাজ চলছে।]

অনুকূল ।। পরদিন সকালবেলা মণিশঙ্কর আমাকে নিয়ে গেল জাহিরগ্রামের জমিদার রমাকান্ত রায়ের কাছারিতে। কাছারি তখন একেবারে গমগম করছে। সার বেঁধে সব রায়েতরা দাঁড়িয়ে আছে, খাজনা আদায়ের কাজ চলছে। এক ফাঁকে মণিশঙ্কর বাবুর কানে কানে কী যেন বললে। বাবু তাঁর লাল দুটি চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। তারপর হুকুম দিলেন—

রমাকান্ত ।। (অন্ধকার থেকেই) ওরে, এই বাবুদুটিকে আমার বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসা। জলটল দে। আমি এই হারামজাদাগুলোকে শায়েস্তা করেই যাচ্ছি।

[অনুকূল ও মণিশঙ্কর ঘাড় ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে। অলো জ্বললে দেখা যায়, জাহিরগ্রামের জমিদার রমাকান্ত রায়ের ঘর। মণিশঙ্কর আর অনুকূল সামনে দাঁড়িয়ে।]

বলছ?

মণিশঙ্কর ।। আজ্ঞে হুজুর। আপনি নিজেই একবার কথা বলে দেখুন।

রমাকান্ত ।। না না, কথা বলার কিছু নেই। শোন বাপু, তোমাকে একটি নাটক রচনা করতে হবে। দশ দিনের মধ্যে।

অনুকূল ।। আজ্ঞে সে আমি শুনেছি।

রমাকান্ত ।। নাটক মানে ব্যঙ্গ। পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে ওই চোরেদের বংশের প্রতি ব্যঙ্গ। বুঝতে পেরেছ?

অনুকূল ।। তাও জানি, তবে চোরেদের বংশ বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হচ্ছে—

রমাকান্ত ।। সেটাই জান না? তবে আর জান কি? ওই যে আহিরগ্রামের জমিদার কালীকান্ত চৌধুরি। তাকে, তার গুষ্টিকে একবার ইয়ে করে ঝাঁঝরা করে দিতে হবে।

মণিশঙ্কর ।। আজ্ঞে এ আর বুঝবে না? একেবারে যাকে বলে ঝাঁঝরা করে দিতে হবে, এই তো? সে অনুকূল খুব পারবে।

রমাকান্ত ।। কাজটা আমি নিবারণকেই দেব বলে এঁচে রেখেছিলুম, এ সব খেলা তার মাথাতেই আসে ভাল। কিন্তু সে তো নাকি একাজ্বরিতে কাতরাচ্ছে। এদিকে আমি তো দেরি করতে পারি নে। তা বেশ, মণি তোমাকে নিয়ে এসেছে যখন, করো, দেখি। আর ব্যাপারটা এখন গোপন রাখতে হবে, গোপন। সেইজন্যেই কাছারিবাড়ি থেকে তোমাদের এই বৈঠকখানায় আসতে বললাম। হারামজাদা কালীকান্ত যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।

অনুকূল ।। আজ্ঞে বুঝেছি। কিন্তু—

মণিশঙ্কর ।। কিন্তু কিসের? একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে নেমে পড়। হুজুরের মান রক্ষা করা চাই কিন্তু। ওই আহিরগ্রামকে একেবারে কাদায় টেনে নামিয়ে— ওঃ, এই মতলবটি যে আপনার মাথায় কী করে এসেছিল হুজুর, সে কথাই আমি অবাক হয়ে ভাবি।

রমাকান্ত ।। কদিন আগে কলকাতায় গেসলাম না? তো থেটার দেখতে গিয়েছিলুম। অমৃতলাল বোস লিখেছে, বউমা। তোমাদের ওই আজকাল কে একটা হয়েছে, অশ্লীল সব পদ্য লেখে, কিছুই বোঝা যায় না। ওই যে বেম্ম সমাজের দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলেটা।

মণিশঙ্কর ।। রবিঠাকুর!

রমাকান্ত ।। হ্যাঁ হ্যাঁ, রবি—এক কথায় নাম মনে পড়ে গেল? ওর পদ্য পড়োটড়ো নাকি?

মণিশঙ্কর ।। আজ্ঞে না না, ও সব কেউ পড়ে নাকি? অশ্লীল, তার ওপর কিছু বোঝা যায় না!

রমাকান্ত ।। ওঃ, লিখেছে বটে অমত্ত বোস, বুঝলে। সুরুচিসম্পন্ন কোন কবির কথায়—বুঝলে, রবিঠাকুরের নামে বলেছে, বেম্ম তো—

সুরুচিসম্পন্ন কোন কবির কথায়
পায়ে ধরি প্রাণনাথ কহিল আমায়—
ব্যাটাছেলে তার বউ-এর পায়ে ধরছে, বোঝ অবস্থা,
দাঁড়াতে বিশ্বের মাঝে ছাড়িয়া বসন
ছাদেতে নিরালা নহে বুঝ বিচক্ষণ
ঢালিবে জ্যোছনা অঙ্গে চাঁদ সারারাত
লাজহীন পবিত্রতা দেখিবেন নাথ।

মণিশঙ্কর ।। লাজহীন পবিত্রতা! ওঃ হো হো! বড় ভাল লিখেছে ব্যাটা। বড়ো সরেস লিখেছে। লাজহীন পবিত্রতা দেখিবেন নাথ। হো হো হো!

রমাকান্ত ।। তা সেই থেটার দেখে আমার মনে পড়ল, আমার বাগানবাড়িটা তো পড়েই থাকে, তা সেখানে এই রকম একটা থেটার লাগিয়ে দিই না কেন? কালীকান্তকেও গুষ্টিশুদ্ধু নেমন্তন্ন করব, এসে দেখে যাক নিজের বংশের কুকীর্তি। কী, কেমন হবে বলো তো?

মণিশঙ্কর ।। আজ্ঞে খুব ভাল হবে, খুব সরেস হবে, একেবারে মুখের ওপরটিতে জুতো মারা হবে।

রমাকান্ত ।। কিন্তু তুমি তো বাপু রা কাড়ছ না। ঠিক করে লিখতে পারবে তো? ডোবাবে না?

মণিশঙ্কর ।। আজ্ঞে না না, ও তো—

রমাকান্ত ।। তুমি চুপ করো। আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি। কী হল? অনুকূলচন্দ্র?

অনুকূল ।। আজ্ঞে পারব। কিন্তু কী নিয়ে লিখব—

রমাকান্ত ।। আহা, সে তো আমি তোমাকে বলে দেবই। শোন তবে। কিন্তু দশ দিনের মধ্যে লিখে ফেলা চাই। মনে থাকবে তো?

[রমাকান্ত বলছে, শুনতে শুনতে এগিয়ে আসে অনুকূল, রমাকান্ত আর মণিশঙ্কর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। অনুকূল কিছু ভাবছে। বসে। খানিকটা লেখে, কাটাকুটি করে। চুলের মুঠি ধরে বসে থাকে। প্রভা ঢোকে।]

প্রভা ।। তোমার কাণ্ডটা কি আমাকে বলবে বাবা। তখন থেকে বলছি নাইতে যাও নাইতে যাও—

অনুকূল ।। পরে পরে।

প্রভা ।। না পরে নয়, এক্ষুনি।

অনুকূল ।। এখন বিরক্ত করিসনি, একটা জরুরি কাজ করছি।

প্রভা ।। কাজ মানে তো ওইসব ছাইপাঁশ লেখা। ও দু দণ্ড পরে করলে কিচ্ছু হবে না। এসো, এসো বলছি।

[প্রভা অনুকূলের হাত ধরে টানে। হঠাৎ পাগলের মতো দাঁড়িয়ে বীভৎস চিৎকার করে ওঠে অনুকূল। প্রভা ভয়ে পিছিয়ে যায়।]

অনুকূল ।। হাজার বার করে বলছি আমার কাজ আছে আমি এখন নাইতে যেতে পারব না।

[প্রভা ভয়ার্ত মুখে ঘর থেকে চলে যায়। একটু চুপ করে থেকে অনুকূল আবার লিখতে বসে। মাথায় কিছু আসছে না। লেখার কাগজ কাটাকুটি করে ছেঁড়ে। উঠে আসে দর্শকের সামনে।]

দশ দিন। দশ দিনের মধ্যে একটা প্রহসন লিখে দিতে হবে। ভোর হতে না হতে লিখতে বসি। লিখি, কাটি, রাত্তিরবেলা সেই লেখার সামনে ভূতে পাওয়া মানুষের মত বসে থাকি। ভিক্ষুক সুর করে ভিক্ষে চাইতে এলে তাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করি। কোনো নিরীহ পথিক জানালার বাইরে থেকে আমাকে পথ জিজ্ঞেস করলে তাকে জাহান্নামে যাবার উপদেশ দিই। কেউ বোঝে না, আমি একটা খুব মজার প্রহসন লিখছি।

[অন্ধকার হয়। পুরনো থিয়েটারের বাজনা বেজে ওঠে। আলো জ্বললে দেখা যায়, মহলার ঘর। সেখানে উপস্থিত মণিশঙ্কর আর অনুকূল। সঙ্গে আরো দু-চারজন অভিনেতা আছে। একজন অভিনেতা গান গাইছে—চোর বংশের নাগর আমি আহিরগ্রামে বাস।]

মণিশঙ্কর ।। হচ্ছে না, হচ্ছে না ঈশেন। আর একটু চটক আনো দিকি। আর একটু ঢলানি। এই দেখো এই রকম—

চোর বংশের নাগর আমি আহির গ্রামে বাস
আহিরগ্রামে বাস
আহিরগ্রামে বাস।

এইখানে তেহাইটা পড়বে বুঝলে না।

ঈশেন ।। আজ্ঞে তা আর বুঝিনি, সব বুঝিচি। সে সব আমি করে দেব, আপনি দেখে নেবেন।

মণিশঙ্কর ।। না না, দেখে নেবো টেখে নেবো নয় হে। যা করবার আজকেই করতে হবে। এক্ষুনি। হুজুর আজকে মহলা দেখতে আসছেন। তাঁকে যে করে হোক খুশি করতে হবে তো।

ঈশেন ।। ও আপনি ভাববেন না, তিনি খুশি হয়ে যাবেন।

মণিশঙ্কর ।। খুশি হয়ে যাবেন মানে? তোমার হাবভাব তো আমার মোটেই ভাল লাগছে না হে। কেমন একটা গা ছাড়া ধরন। আরে জোরদার করে লাগো। কী হে, অনুকূল, একা আমি বললে কী হবে, তুমি কিছু বলো।

অনুকূল ।। কী বলব?

মণিশঙ্কর ।। (কাছে চলে গিয়ে) কী বলব মানে? তোমার কি হয়েছে বলো তো?

অনুকূল ।। কই, কিছু না।

মণিশঙ্কর ।। কিছু না বললে চলবে? আমি তো তোমাকে আজ থেকে চিনি না। মন থেকে সায় পাচ্ছ না, তাই তো?

[অনুকূল মাথা নেড়ে সায় দেয়]

ভেতরে কামড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এ সব কী লিখেছি। কি, ঠিক কিনা?

অনুকূল ।। যা দেখাবার তুমিই ওদের দেখিয়ে দাও না ভাই। আমি এ সব বুঝি না।

মণিশঙ্কর ।। আমিও বুঝি না। কিন্তু না বুঝেও লাফালাফি করতে হবে। চেঁচাতে হবে। গালমন্দ করতে হবে। হুজুর এসে তোমাকে দেখে যেন মনে করেন, এ লোকটা এই নাটকের কাজে জীবনমরণ সব সমর্পণ করে দিয়েছে। বলি মেয়ের বিয়ের টাকাটা জোগাড় করতে হবে তো, নাকি?

[নেপথ্যে গোলমাল শোনা যায়।]

হুজুর আসছেন।

[পলকে ঘরের চেহারা পালটে যায়। ঈশান গান ধরে, তারপর জমিদারবাবু ঢুকলে যেন এতক্ষণ খেয়াল করেনি এমন একটা ভাব করে জিভ কেটে পেন্নাম করে।]

রমাকান্ত ।। কী, সব ঠিকঠাক আছে তো?

[মণিশঙ্কর কনুইয়ের গুঁতো দেয় অনুকূলকে।]

অনুকূলচন্দ্র?

অনুকূল ।। আজ্ঞে।

রমাকান্ত ।। প্লে জমে যাবে তো?

মণিশঙ্কর ।। আজ্ঞে জমে একেবারে নগেন ময়রার দই হয়ে যাবে হুজুর, উপুড় করলেও পড়বে না।

রমাকান্ত ।। তোমার এই একটা বড় দোষ হে মণিশঙ্কর। আগ বাড়িয়ে কথা বলা। আমি জিজ্ঞেস করছি অনুকূলচন্দ্রকে, তুমি তার মধ্যে ঢুকে পড়ে ফুট কাটছ কেন?

অনুকূল ।। আজ্ঞে হুজুর যদি একবার মহলাটা নিজের চোখে দেখেন।

রমাকান্ত ।। সে তো দেখবই, কিন্তু তার আগে তোমার কথাটা শুনি।

অনুকূল ।। আমার বড্ড ভয় করছে।

রমাকান্ত ।। ভয় করছে?

মণিশঙ্কর ।। যদি প্লে না জমে। কিন্তু হুজুর আমি বলছি আপনাকে—

[রমাকান্ত হাত তুলে মণিশঙ্করকে থামায়। এগিয়ে আসে অনুকূলের দিকে।]

রমাকান্ত ।। প্লে জমাতেই হবে অনুকূলচন্দ্র। ওই হারামজাদা কালীকান্ত নিজের চোখের জল পোঁদে পুঁছতে পুঁছতে আসর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য দেখবার আগে আমার শান্তি নেই। এই, শুরু করো।

[ঈশান লাফিয়ে উঠে গান ধরে]

ঈশান ।। চোর বংশের নাগর আমি আহিরগ্রামে বাস
জাহিরগ্রামের এঁটো খেয়ে কাটাই বারোমাস
মুচির কুকুর উঠছি ফুলে
রাতের বেলা দুলে দুলে
রমাকান্তবাবুর মাঠে খেয়ে বেড়াই ঘাস।

[বিকট স্বরে হেসে ওঠে রমাকান্ত।]

মণিশঙ্কর ।। হুজুরের পছন্দ হয়েছে তো?

রমাকান্ত ।। দেখতে দাও, দেখতে দাও।

[আলো নেভে। আলো জ্বললে দেখা যায় নেপথ্যে গান চলছে। সঙ্গে সংলাপ ইত্যাদি। দুজন মোসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কালীকান্ত ঢোকে।]

প্রথম মোসাহেব ।। হুজুর।

কালীকান্ত ।। পালকি কোথায়?

প্রথম মোসাহেব ।। আমি এক্ষুনি ডেকে আনছি হুজুর।

[প্রথম মোসাহেব দৌড়ে চলে যায়।]

দ্বিতীয় মোসাহেব ।। ছি ছি ছি, এ কি ভদ্দরলোকের কাজ? থেটার দেখবার জন্যে নেমন্তন্ন করে এনে—

[কালীকান্ত চাপা গলায় এ-ই বলে গর্জন করে ওঠে। দ্বিতীয় মোসাহেব ভয় পেয়ে থমকে যায়।]

কালীকান্ত ।। পালকি আসতে এতক্ষণ লাগে? হারামজাদা, গু খোরের ব্যাটা।

দ্বিতীয় মোসাহেব ।। ওই যে হুজুর, এসে গেছে। আসুন, এই পথে আসুন।

[কালীকান্ত ও দ্বিতীয় মোসাহেব বেরিয়ে যায়। নেপথ্যে থেকে নাটক শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে দর্শকের উচ্ছ্বাস। বহু মানুষ মঞ্চে হাসতে হাসতে ঢোকে। হাসির শব্দ, তার সঙ্গে—বহুৎ

আচ্ছা, শোভান্তরি, মৃত্তিকে রে বাবা, মৃত্তিকে। বহুৎ খুব। জিতে রহো ব্যাটা। ভ্যালা মোর বাপ ইত্যাদি। সবাই চলে যায়। অন্ধকার। আলো জ্বললে দেখা যায় মঞ্চে রমাকান্ত আর নিভাননী।]

রমাকান্ত ।। কী, কেমন দেখলে?

নিভাননী ।। ভাল, খুব ভাল।

রমাকান্ত ।। শুধু ভাল? ওই চোরের গুষ্টির মুখে একেবারে জুতোর কালি লেপে দিয়েছে না?

নিভাননী ।। তা সবাই কি বুঝবে, সে কথা?

রমাকান্ত ।। বুঝবে না মানে?

নিভাননী ।। না, এই যে চৌধুরিরা আপনাদের নায়েব ছিল, কোম্পানির কাছে খাজনা পাঠাবার সময় সে খাজনা লুঠ করে নিজেরাই জমিদার হয়ে বসল, এ সব কি সব লোকে জানে?

রমাকান্ত ।। জানে জানে। চৌধুরিদের কীর্তির কথা জানতে কি আর এ তল্লাটে বাকি আছে কারুর? সেই জন্যেই তো, লোকে কেমন হাসছিল দেখলে না।

নিভাননী ।। সে তো চিকের আড়াল থেকে সবই দেখেছি। কিন্তু নাম ধরে বললেই বাপু ভাল হোত।

রমাকান্ত ।। আরে না না, তোমার যেমন বুদ্ধি। নাম ধরে আবার কেউ বলে নাকি। একটু আড়াল রাখলেই তো মজা গিন্নি।

নিভাননী ।। তা বটে, আমিও মজা পেয়েছি খুব। বিশেষ করে যখন ওই গানটা ধরল না—চোর বংশের নাগর আমি আহিরগ্রামে বাস—বাবারে বাবা, পারেও বটে লোকটা।

রমাকান্ত ।। কে অনুকূলচন্দ্র তো? ও একটা জিনিয়াস।

নিভাননী ।। কি আস?

রমাকান্ত ।। জিনিয়াস জিনিয়াস। মানে ইংরিজি। মানে এক্কেবারে পয়লা নম্বর। কথাটা এবারে কলকেতায় গিয়ে শিখেছি।

[আলো নেভে। আলো জ্বললে দেখা যায় হাসতে হাসতে সামনে এগিয়ে আসে অনুকূল, মণিশঙ্কর, নিবারণ। মঞ্চে রমাকান্ত হাসিতে ফেটে পড়ছে।]

রমাকান্ত ।। কুকুর দেখেছ, খেঁকি কুকুর?

মণিশঙ্কর ।। আজ্ঞে তা আর দেখব না হুজুর? রাস্তায় ঘাটে খেঁকি দেখতেই তো বড় হলুম।

নিবারণ ।। দেখেছি হুজুর, মুখখানা ঠিক আমার মত।

রমাকান্ত ।। তোমার মতো? বলো কি হে নিবারণ, তোমার মত?

নিবারণ ।। আজ্ঞে কপালটাও আমার ওই খেঁকি কুকুরের মত কিনা, দোরে দোরে লাথি খেয়ে খেয়েই জীবন গেল।

রমাকান্ত ।। কথাখানা যেন কেমন শোনাল হে নিবারণ।

নিবারণ ।। আজ্ঞে দোষ ঘাট না নেন তো বলি, এই পালাখানি তো হুজুর আমাকেই লিখতে দিয়েছিলেন।

রমাকান্ত ।। তা দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু তুমি আবার অসুখে পড়ে গেলে, এদিকে আমার থেটার তো আমি তার জন্যে বন্ধ করে দিতে পারি নে। তাই অনুকূলচন্দ্রকে দিয়ে লেখাতে হল। তবে পালাখানি লিখেছে কিন্তু খাসা। তুমি এতটা পারতে না। কী, পারতে?

নিবারণ ।। আজ্ঞে তা বোধহয় পারতাম।

রমাকান্ত ।। মানে? তুমি এই রকম একটা পালা লিখতে পারতে?

নিবারণ ।। পারতাম বলেই মনে হয় হুজুর।

রমাকান্ত ।। কক্ষনো পারতে না হে নিবারণ, আমি তোমাকে বলছি।

নিবারণ ।। হুজুরের কথা অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই, তবে সুযোগ পেলে দেখিয়ে দিতাম হুজুরেরও কখনো কখনো ভুল হয়।

মণিশঙ্কর ।। নিবারণ!

রমাকান্ত ।। মানে? কী বললে তুমি? তুমি তো ভারি ঢ্যাঁটা লোক হে? আমি বলছি তুমি ওর মত লিখতে পারতে না, তুমি আমার ভুল ধরতে এসেছ?

নিবারণ ।। না না, ভুল ধরা নয়!

রমাকান্ত ।। নয় আবার কী? পষ্ট মুখে মুখে কথা করছ, আবার—

নিবারণ ।। ছি ছি এ কী বলছেন হুজুর! আমি কি কখনো আপনার সঙ্গে মুখে—

রমাকান্ত ।। কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এতবড় আস্পদ্দা তোমার? নিজে তো অসুখ হয়েছে বলে গা ঢাকা দিয়ে বসে রইলে। কী ভেবেছিলে? আমি হাত-পা কোলে করে কেঁদে বেড়াব? এ কাজের যুগ্যি একজনকে পেয়ে গেলাম কিনা, তাই হিংসেয় একেবারে জ্বলে-পুড়ে মরছে। কুকুরের কথা হচ্ছিল না, এই দেখলে তো কুকুরের স্বভাব? লাই দিলে মাথায় ওঠে। যাও যাও, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। কি হল, যা-ও।

নিবারণ ।। হুজুর আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, আমি—

রমাকান্ত ।। আবার মুখে মুখে কথা? হারামজাদা, জুতো দিয়ে যদি তোমার মুখ ছেঁচে না দিই তো আমার নাম রমাকান্ত রায় নয়। ওরে, কে আছিস!

নিবারণ ।। কাউকে ডাকতে হবে না হুজর, আমি যাচ্ছি।

[নিবারণ আগুন ঝরানো চোখে মণিশঙ্কর ও অনূকূলের দিকে তাকায়। তারপর বেরিয়ে যায়।]

রমাকান্ত ।। চিরকালের বজ্জাত লোকটা! হারামজাদা। জুতিয়ে মুখের চামড়া তুলে নিতে হয়। বলে আমারও ভুল হয়। পাইক পাঠিয়ে ওর ভিটেমাটি যদি চটি না করেছি তাহলে আমার নাম বদলে রেখো। (অনুকূলকে)

এই, তুমি অমন চুপ করে থেকো না তো, আমার কেমন লাগে। জুলজুল করে মুখের দিকে চেয়ে আছে। হ্যাঁ, কী কথা যেন হচ্ছিল? কী হে, সব চুপ মেরে গেলে কেন? কী বলছিলুম আমি তখন?

মণিশঙ্কর ।। আজ্ঞে, ওই খেঁকি কুকুরের—

রমাকান্ত ।। হ্যাঁ, খেঁকি কুকুরের—কি দেখেছ কখনো, খেঁকি কুকুর? বাক্যি হরে গেল যে, দেখেছ?

মণিশঙ্কর ।। আজ্ঞে।

রমাকান্ত ।। লাঠি হাতে নিলেই দেখবে, ল্যাজ গুটিয়ে কেঁই কেঁই করতে করতে পালাচ্ছে। নিবারণ যেমন করে পালাল।

মণিশঙ্কর ।। একেবারে কেঁই কেঁই কেঁই!

রমাকান্ত ।। কালীকান্তর অবস্থাও ঠিক তাই।

মণিশঙ্কর ।। সে তো দেখলুম হুজুর, থেটার শেষ হবার আগেই হুমহুম করে চলে গেল। মুখ যেন আমসি। পোড়া হনুমান।

রমাকান্ত ।। যা বলেছ। ভাল লিখেছ হে অনুকূলচন্দ্র, একেবারে যাকে বলে ঠেসে দিয়েছ। প্রথমে তোমার মুখ দেখে আমি ঠিক ভরসা পাইনি, কিন্তু এখন তো দেখছি তুমি একটি বর্ণচোরা আম।

অনুকূল ।। হুজুরের দয়া।

মণিশঙ্কর ।। আমি কিন্তু আপনাকে আগেই বলেছিলুম হুজুর, একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন, ঠকবেন না।

রমাকান্ত ।। তা বলেছিলে বটে। যাক গে, রাত হল, যাই, অন্দরমহলে যাই। তোমরা তাহলে এসো।

অনুকূল ।। আজ্ঞে।

মণিশঙ্কর ।। বটেই তো বটেই তো, হুজুর তো এখন একটু জিরোবেন নাকি? কদিন ধরে কম ধকল তো গেল না। একা হাতে এতবড় একটা যগ্নি সামলানো। তাহলে হুজুর, পেন্নাম।

রমাকান্ত ।। আর অনুকূলচন্দ্র, তুমি মাঝে মাঝে আমার বৈঠকখানায় এসো। তোমাকে নিয়ে একটা মতলব মাথায় এসেছে।

[রমাকান্ত চলে যায়।]

মণিশঙ্কর ।। কি বুঝলে অনুকূলচন্দ্র, মোসাহেবের চাকরি?

অনুকূল ।। ওই লোকটার তো কোনো দোষ ছিল না। অসুখ করেছিল, তা নইলে—

মণিশঙ্কর ।। সে আর কী করবে বলো, ওর কপাল।

অনূকূল ।। আচ্ছা ওই যে উনি বললেন, আমাকে নিয়ে যেন কী একটা কাজ আছে।

মণিশঙ্কর ।। আছে নিশ্চয় কিছু একটা খেয়াল।

অনুকূল ।। আমি যদি দেখা না করি?

মণিশঙ্কর ।। পাইক পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে যাবে। তোমাকে জমিদারমশাইয়ের পছন্দ হয়েছে অনুকূল, আর তুমি ওর হাত ছাড়াতে পারবে না।

অনুকূল ।। আমি যদি বলি, আপনি যা বলছেন তা আমি পারব না?

মণিশঙ্কর ।। ঘরে সোমত্ত মেয়ে, জমিদারের সঙ্গে শত্রুতা করার কথা ভুলেও ভেব না অনুকূল।

অনুকূল ।। শত্রুতা তো নয়, শুধু—

মণিশঙ্কর ।। বড়লোকের রীতিই হল যারা তার কথায় সায় দেয় না তাদেরই শত্রু বলে ভাবা। তুমি হলে ওর পায়ের তলার চটি, ওর পোষা কুকুর। কুকুর যদি বলে জিভ বার করে মনিবের কাছে ছুটে আসবে না, মনিব তাকে শাস্তি দেয়, বুঝেছ?

অনুকূল ।। আমার ঘেন্না করছে।

মণিশঙ্কর ।। গিলে ফেল। বাপ ঠাকুরদার জমানো ঘড়ার জলও শেষ হয়ে আসছে। মেয়ের বিয়ের টাকা লাগবে। এখন এ সব ভাবতে বোস না। যা বলে, চোখ বুজে তাই করে যাও। মাথাটা যতটা পার ঝুঁকিয়ে। বুঝলে?

[মণিশঙ্কর অনুকূলের কাঁধে হাত রাখে। হাত ছাড়িয়ে অনুকূল সামনে চলে আসে। মণিশঙ্কর ধীরে ধীরে চলে যায়, মঞ্চে আসে রমাকান্ত। অনুকূলের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।]

রমাকান্ত ।। বুঝলে অনুকূলচন্দ্র।

অনুকূল ।। হুজুর!

রমাকান্ত ।। থেটার তো হল, ভালই হল। লোকে বেশ ধন্যি ধন্যি করছে।

অনুকূল ।। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। বলছে, আপনি আপনার বংশের মুখোজ্জ্বল করেছেন।

রমাকান্ত ।। বলছে না? সে তো বলবেই। তবে ভেবে দেখলাম, এতে অনেক হ্যাপা।

অনুকূল ।। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

রমাকান্ত ।। ভাবছি, একটা কাগজ বার করব।

অনুকূল ।। কাগজ?

রমাকান্ত ।। হ্যাঁ। তুমি হবে তার সম্পাদক।

অনুকূল ।। সম্পাদক মানে—আমাকে কী করতে হবে?

রমাকান্ত ।। তুমি শুধু ওই কালীকান্ত রায় আর তার গুষ্টিবগ্গের নামে বাছা বাছা গালাগাল লিখে যাবে। যা পড়ে লোকে একেবারে হাসতে হাসতে ফুটিফাটার মত ফেটে যায়। তোমার এলেম আছে, তুমি পারবে।

অনুকূল ।। কিন্তু—

রমাকান্ত ।। কিন্তু আবার কী? নেমে পড়ো, নেমে পড়ো। খোদ কলকেতা থেকে ছাপাব। এ তল্লাটে একেবারে হইচই বাধিয়ে দিতে হবে, বুঝলে।

[চলে যায় রমাকান্ত। পরাজিতের মত লেখার টেবিলে এসে বসে অনুকূল। মাথা নিচু করে থাকে। প্রভা ঢোকে। অনুকূলকে লেখার টেবিলে দেখে একটু ইতস্তত করে, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। মুখ তুলে প্রভাকে চলে যেতে দেখে অনুকূল। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। আলো বদলায়। নাটক শুরুর দৃশ্যটা ফিরে আসে। বেশ কিছু লোক, একে অপরের দিকে তেড়ে যাচ্ছে, কিছু একটা বিদ্রূপ বা গালমন্দ করে ফিরে আসছে। বিজয়ীদের অট্টহাসি, বিরুদ্ধপক্ষের চিৎকার যেন কান ফাটিয়ে দেবে। এরপর অন্ধকার হয়। আলো জ্বললে দেখা যায় কালীকান্তর বউ লাবণ্য ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসে।]

কালীকান্ত ।। আরে কী হল কি বলবে তো?

লাবণ্য ।। কী হল যদি নাই বোঝেন তাহলে আর বুঝে কাজ নেই। আমি বরং দড়ি কলসি নিয়ে পুকুরে ডুবে মরি।

কালীকান্ত ।। এই দেখ, এই সব অলুক্ষুণে কথাবার্তা—

লাবণ্য ।। অলুক্ষুণে কথাবার্তা? বলি অলক্ষণের আর বাকি রইল কিছু?

কালীকান্ত ।। আচ্ছা লাবণ্য, এমন করলে কী করে হবে বলো তো? তোমার অভিমানের কারণটাই যদি আমি না জানতে পারি—

লাবণ্য ।। (ভেঙচিয়ে) যদি জানতে না পারি। কথা শুনলে অঙ্গ জ্বলে যায়। আমার মুখ থেকে জানতে হবে? নিজে বুঝতে পারেন না? ওই রায়বাড়ি। এক তো কী একটা পালা করলে, শুনলুম আমাদের গুষ্টির নামে নাকি যা নয় তাই বলেছে।

কালীকান্ত ।। ও, এই কথা!

লাবণ্য ।। কেন, কথাটার কোনো দাম নেই বুঝি? কাল অমূল্য এসেছিল, আমার দেওর। সে বললে, তোদের নামে তো কান পাতা যাচ্ছে না দিদি। রায়রা কী একটা কাগজ বার করেছে, তাতে যা লেখা আছে সে নাকি একেবারে ঢিঢি পড়ে গেছে।

কালীকান্ত ।। হুঁ।

লাবণ্য ।। হুঁ! হুঁ বলে চুপ করে গেলেই চলবে? একবার পালা, একবার কাগজ, আর আপনি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন। এ জ্বালা আমার আর সহ্য হয় না। আমি আজই খিড়কির পুকুরে ডুব দিয়ে মরব।

কালীকান্ত ।। আরে একি, একি, এক্ষুনি চললে নাকি? শোন শোন, আহাহা, ও কাজ কোর না। একটা কেচ্ছা হবে, তাই নিয়ে রমাকান্ত হারামজাদা আবার তার কাগজে লেখাবে।

লাবণ্য ।। তাহলে, কিছু একটা করুন।

কালীকান্ত ।। দেখি। লেঠেল পাঠাব কিনা ভাবছি।

লাবণ্য ।। দেখি টেখি না। যা হয় কিছু করুন, নইলে আমার জ্বালা জুড়োচ্ছে না। দুদিনের মধ্যে এর প্রিতিবিধান না করলে আপনি আমার মরা মুখ দেখবেন, এই আমি বলে দিলাম, হ্যাঁ।

[দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় লাবণ্য। আলো পালটায়। সামনের মঞ্চে এগিয়ে আসে কালীকান্ত। কী করবে ভাবছে। হঠাৎ নিবারণ হুজুর বলে ছুটে এসে পায়ে পড়ে।]

কালীকান্ত ।। কে, কে তুমি? আরে একি, পা ছাড়ো পা ছাড়ো, সোজা হয়ে দাঁড়াও দেখি। আরে কী বিপদ,। তুমি চাওটা কি?

নিবারণ ।। আজ্ঞে হুজুর যদি ভরসা দেন তো বলি।

কালীকান্ত ।। হ্যাঁ বলো। কী চাও?

নিবারণ ।। আজ্ঞে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাই।

কালীকান্ত ।। শোন কালীকান্ত রায় সোজা কথার মানুষ—এ সব হেঁয়ালি সে বোঝে না। যা বলবার মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে বলো।

নিবারণ ।। আমাকে আপনি আশ্রয় দিন হুজুর। আমাকে বাঁচান।

কালীকান্ত ।। বাঁচাব? তা তোমাকে মারছে কে?

নিবারণ ।। আজ্ঞে জমিদার রমাকান্ত চৌধুরি।

কালীকান্ত ।। রমাকান্ত! কেন, কী করেছিলে তুমি তার?

নিবারণ ।। আজ্ঞে কিছুই করিনি, শুধু একটু স্পষ্ট কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম—হুজুর, জমিদার কালীকান্ত রায় মশায় মানী মানুষ, তাঁকে নিয়ে এমন একটা পালা লিখে থেটার করা কি উচিত কাজ হল?

কালীকান্ত ।। বলেছিলে এই কথা? মানে, মুখের ওপর বলেছিলে?

নিবারণ ।। আজ্ঞে বলেছিলুম। জানি আমি ক্ষুদ্র মানুষ, তাঁর কাছে পোকামাকড় বললেই হয়। কিন্তু কী করব, যা হচ্ছিল, না বলে থাকতে পারলাম না হুজুর।

কালীকান্ত ।। বটে বটে! তা কী জবাব দিলে সে তার?

নিবারণ ।। সে আপনার নামে অনেক কথা, সে সব আমি মুখে আনতে পারব না। আর আমাকে পাইক দিয়ে জুতো মারতে মারতে—

[নিবারণ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে।]

কালীকান্ত ।। বাঃ, বাঃ! উচিত কথা বললে এই হল তার পুরস্কার। হবে না কেন? ও নামেই জমিদার, রক্তটা তো ঝি চাকরের রক্ত। যাক গে, তাহলে তুমি এখন চাও কি?

নিবারণ ।। ও গাঁয়ে তো আমি আর ফিরে যেতে পারব না। এতক্ষণে ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। হুজুর আপনার শ্রীচরণে আমাকে আশ্রয় দিন। আর—

কালীকান্ত ।। আর?

নিবারণ ।। হুজুরের যে অপমান ওই রমাকান্ত করেছে, আমি তার জবাব দিতে চাই।

কালীকান্ত ।। কীভাবে?

নিবারণ ।। আমি বলি কি, আপনিও একটা কাগজ বার করুন হুজুর।

কালীকান্ত ।। কাগজ? আমি?

নিবারণ ।। আপনি, আপনি। ওদের সম্পাদক যেমন ওই অনুকূল, আপনার কাগজের সম্পাদক করুন তেমনি আমাকে। পাল্টা গাল কি করে দিতে হয় সে আমি দেখিয়ে দেব।

কালীকান্ত ।। পারবে?

নিবারণ ।। পারব হুজুর।

কালীকান্ত ।। না না, আমার ঠিক ভরসা হচ্ছে না। ওই অনুকুলচন্দ্র, আর কিছু না হোক লেখে ভাল। যদি হেরে যাও সে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

নিবারণ ।। আজ্ঞে তাহলে পাইক দিয়ে জুতো মারতে মারতে আমাকে আপনার এলাকার বাইরে বার করে দেবেন।

কালীকান্ত ।। ওই এক শিখেছ তোমরা, পাইক দিয়ে জুতো মারা। তাতে আমার কী হবে? তোমাকে কে চেনে? দুয়ো যা দেবার দেবে তো আমাকে।

নিবারণ ।। দুয়ো আপনাকে হজম করতে হবে না হুজুর। একটা কথা আপনাকে বলি। অনুকূলচন্দ্র মোসাহেবিতে নতুন। এখনো আড় ভাঙেনি। আর আমি হচ্ছি সাত ঘাটের লাথি খাওয়া কুকুর। গালমন্দটা আমি ওর চেয়ে বেশি জানি, আর লোকে কী পেলে আহ্লাদে ফুটিফাটা হয়, তাও আমার ওর চেয়ে অনেক বেশি জানা আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কালীকান্ত ।। বেশ, দেখো কদ্দূর কি করতে পার।

[কালীকান্ত বেরিয়ে যায়। নিবারণ মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসে। তারপর কুৎসিতভাবে কোমর দোলায়। আবার সেই দৃশ্য। অনেক লোক, হাসতে হাসতে তেড়ে যাচ্ছে, বিকট চিৎকার। এক কোণে আলো জ্বলে। সেখানে দেখা যায় রমাকান্ত ও অনুকূলকে।]

রমাকান্ত ।। কী করছ কি তুমি, জবাব দাও। লিখেছে আমার ঠাকুরদার জন্ম নাকি বাড়ির চাকরের ঔরসে। এর যোগ্য জবাব তোমাকে দিতে হবে অনুকূল।

অনুকূল ।। এর জবাব—আমি—

রমাকান্ত ।। থতমত খাচ্ছ কেন? তোমারও ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে জবাব নয়, একেবারে মুগুর মারতে হবে, মাথায় ঢুকেছে?

[সেই আলো চলে যায়। অন্য কোণে আলো জ্বললে দেখা যায় উৎকট হাসিতে ফেটে পড়ছে কালীকান্ত, সামনে দাঁড়িয়ে নিবারণ।]

কালীকান্ত ।। ভো কাট্টা, তোমার অনুকূলচন্দ্র তো ভো কাট্টা হয়ে গেল হে নিবারণ।

নিবারণ ।। আজ্ঞে আপনাকে বলেছিলাম না হুজুর।

কালীকান্ত ।। এবারের লেখাটি বড় সরেস লিখেছ হে। লোকের মুখে এ ছাড়া আর কথা নেই।

নিবারণ ।। সবই আপনার আশীর্বাদ।

কালীকান্ত ।। বড় খুশি হয়েছি, বড় খুশি হয়েছি নিবারণ। এই নাও, তোমাকে পারিতোষিক দিলুম।

[কালীকান্ত গলা থেকে মালা খুলে নিবারণকে দেয়। উল্টোদিকে আলো জ্বলে ওঠে।]

রমাকান্ত ।। জমছে না জমছে না। দিনকে দিন তোমার লেখাগুলো যেন পান্তাভাত হয়ে যাচ্ছে। এই, তুমি ওই কালীকান্তর থেকে টাকা খাচ্ছ কিনা ঠিক করে বলো তো।

[রমাকান্তের জোনে আলো নেভে। অসহায়ের মত, প্রায় টলতে টলতে বসে পড়ে অনুকূল। নিবারণকে দেখা যায়।]

নিবারণ ।। হে পাঠক, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, অনুকূলচন্দ্র কেন তাহার কন্যাকে অদ্যাবধি আইবুড়ো থুবড়ো করিয়া রাখিয়াছে? বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাওয়া গেল, নিশীথকালে জমিদারবাবু স্বয়ং অনুকূলচন্দ্রের গৃহে গমন করেন। পিতা পাহারায় থাকেন, জমিদারবাবু কন্যার কক্ষে প্রবেশ করেন। রায় বাড়িতে নতুন সন্তান আসিল বলিয়া।

[আড়াল থেকে বহু লোকের কুৎসিত অট্টহাসি শোনা যায়। নিবারণকে পেছন থেকে ডাকে অনুকূল।]

অনুকূল ।। শুনুন।

[নিবারণ থমকে দাঁড়ায়, কোন কথা বলে না।]

এটা আপনি কী করলেন? কেন করলেন এটা আপনি? আমি না হয় আপনার শত্রু, মানলাম। কিন্তু আমার মেয়েটা? প্রভা? সে কী দোষ করেছিল? চুপ করে থাকবেন না, বলুন। কী দোষ করেছিল সে?

নিবারণ ।। কিছু না। আমরা কেউ কোনো দোষ করিনি।

অনুকূল ।। তাহলে?

নিবারণ ।। শুধু দুবেলা দুটি খেয়ে পরে বাঁচতে চেয়েছিলাম। আমি, আপনি—আমরা সব বাবুর বাড়ির কুকুর। বাবুর কথামতো ল্যাজ নাড়ব, বাবু যাকে কামড়াতে বলবে, সে যেই হোক, যদি আমার নিজের মেয়েও হয়—

[নিবারণ দ্রুত বেরিয়ে যায়। অনুকূল ধীরে ধীরে বসে পড়ে। শোনা যায় বিকেলবেলার পাখির ডাক। অনুকূল শুয়ে পড়ে। প্রভা ঢোকে। ধীরে ধীরে অনুকূলের কাছে আসে। ইতস্তত করে মাথায় হাত রাখে। অনুকূল তাকালে ভয়ে হাত সরিয়ে নেয়। তারপর দ্রুত ছুটে চলে যায়।]

অনুকূল ।। প্রভা, মা গো।

[প্রভা থমকে দাঁড়ায়। অবিশ্বাসের চোখে তাকায় বাবার দিকে।]

আয়, কাছে আয়। আয়।

[প্রভা একটু ইতস্তত করে, তারপর অনুকূলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।]

একি, গা যে আগুনের মত গরম। কবে থেকে এমন—

প্রভা ।। গত দুদিন ধরে।

অনুকূল ।। আমাকে বলিসনি কেন মা?

[প্রভা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।]

বুঝতে পেরেছি। চল, ঘরে চল।

প্রভা ।। না।

অনুকূল ।। সন্ধে নামছে, জ্বরো গায়ে—ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে যে মা।

প্রভা ।। দিক গে।

[প্রভা অনুকূলের কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে।]

প্রভা ।। বাবা, এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাবে?

অনুকূল ।। অন্য কোথাও? কোথায়?

প্রভা ।। সে আমি জানি না। অন্য কোথাও। সেখানে তোমার বেশ অন্য একটা নাম হবে, আমারও অন্য একটা নাম। কেউ খুঁজেই পাবে না আমাদের। চলো না বাবা, তেমন একটা জায়গায় আমরা দুজনে চলে যাই। যাবে?

[আলো মায়াময় হয়ে ওঠে, পাখির ডাক শোনা যায়।]

যবনিকা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

রবীন্দ্র-রচনাংশ থেকে দার্শনিক তাৎপর্য

একক-১

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৩.১.১ প্রস্তাবনা

৪০৫.৩.১.১ : প্রস্তাবনা

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক—
হয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা-একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।"

এক কবির সাথে পালয়িনী পৃথিবীর তথা প্রকৃতির আন্তরিক আত্মীয়তা ধ্বনিত হয়েছে পঙক্তিগুলিতে, নিজেকে 'পৃথিবীর কবি' বলে সম্বোধিত করে আপন কর্মের বার্তা ঘোষিত করেছেন কবি। পৃথিবী বা প্রকৃতির সাথে তাঁর নাড়ীর টান এক জীবনের নয়, তা জন্ম জন্মান্তরের। দেশ-কালের সীমা পেরিয়ে এই সম্পর্ককে অনুভব করেছেন কবি। তাঁর মনে হয়েছে বসুন্ধরার প্রতিটি হৃদ-স্পন্দনের হয়তো ধারণ করেছেন তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে। কিন্তু সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু পর্যায়ক্রমে সবই অনুরণিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে, কিন্তু তাঁরই আবার মনে হয়েছে পৃথিবীর সকল সুর ধ্বনিত করা সত্যিই কি সম্ভব! 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!' নিশ্চয় যে সাধনায় তিনি মগ্ন আছেন সেখানে রয়ে গেছে অনেক ফাঁক। সেটাই স্বাভাবিক। তবে কি পৃথিবীর স্বর থেকে যাবে অবাঙ মানস গোচর হয়ে! তা কেন! কবির তো আছে কল্পনা শক্তি। সেই কল্পনার ডানা মেলে তিনি তো ছোঁয়ার চেষ্টা করতেই পারেন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না বিধৌত পৃথিবীর সুরকে। সেই চেষ্টাই তো করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ আজীবন। সেই চেষ্টাই তো মৌনমুখর করেছে তাঁর কল্প যাপনকে, তাঁর কলমকে। আর সে চেষ্টার ফলেই তো আমরা পেয়েছি রবীন্দ্র-রচনার অপূর্ব সম্ভার।

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-১

পাঠান্তর

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৪.১.১ কথারম্ভ
৪০৫.৪.১.২ পাঠান্তরের স্বরূপ
৪০৫.৪.১.৩ রবীন্দ্র-কবিতার পাঠান্তর
৪০৫.৪.১.৪ রবীন্দ্র-উপন্যাসের পাঠান্তর
৪০৫.৪.১.৫ উপসংহার
৪০৫.৪.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি
৪০৫.৪.১.৭ নমুনা প্রশ্ন

৪০৫.৪.১.১ : কথারম্ভ

যে-কোনো সৃষ্টি পরিণত ও সম্পূর্ণ হতে পারে কিন্তু চূড়ান্ত কখনও নয়। তাই স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে বারবার পরিবর্তন করে আত্মসচেতনভবে সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ প্রদান করতে বদ্ধপরিকর থাকেন। স্রষ্টা রচনা করেন পাঠকমহলকে উদ্দেশ্য করে। পাঠক তা পাঠ করে রসগ্রহণ করে ও আনন্দ পায়। রসিক কেবল রসগ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকতে পারেন কিন্তু সমালোচক সেই পাঠ পূর্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে কবিচিত্তের বা স্রষ্টার অন্দরমহলে পৌঁছাতে চান। তাই পাঠান্তরের আলোচনা এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাঠান্তর শব্দের অর্থ এক পাঠ থেকে অন্যপাঠের অন্তঃসম্পর্ক। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'অন্যপাঠ' বা 'পৃথকপাঠ'। খসড়া সৃষ্টি ও পূর্ণরূপ মিলিয়ে না দেখলে সমালোচনা

সম্পূর্ণ রহস্য গোপন থেকে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন স্রষ্টার এই পাঠান্তরের বৈপরীত্য অনুসন্ধান করতে গেলেই বোধগম্য হয় এখনও কত দিক অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। এই ধরনের আলোচনা সেই পথের সন্ধান দিতে কিছুটা হলেও সক্ষম। রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যয়নকারী সকলেই অবগত আছেন যে, তিনি তাঁর অনেক রচনায় প্রভূত পরিমাণে সংস্কার করেছেন! যাঁর সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর রচনা মিলনের কথা বলে, অমৃতময় বাণীর কথা বলে, ভালোবাসার কথা বলে। সুতরাং এমন একজন স্রষ্টার রচনা যে অনেক ভাবনাচিন্তার ফসল তা বলাই বাহুল্য। বাংলা সাহিত্য সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের কাছে উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন রবীন্দ্রনাথের কারণেই। কবিগুরুর দ্বারা রচিত কাব্য, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ও প্রবন্ধাদি আজ সকলের কাছেই সমাদৃত। তাঁর রচনার ভাবগাম্ভীর্যে, সরসতায়, নিপুণতায়, দর্শনে, মানবিকতায়, স্বাদেশিকতায় ও বিশ্বপ্রেমের বার্তায় পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁর সাহিত্য উপলব্ধি করতে হলে বিভিন্ন সময়ে রচিত পাঠের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার মধ্যেই নিবিষ্ট ছিল পরিবর্তন নামক বিষয়টি। রচনার নতুন সংস্করণ প্রকাশকালে পরিবর্তন পরিমার্জন করে নবীনতম পাঠের সংযোজন করে পাঠকের কাছে পৌঁছানো রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রবণতা। যে-কোনো সচেতন ও সতর্ক লেখকমাত্রই এই কাজটি করে থাকেন। তাই তৈরি হয় নব নব পাঠ নব নব দর্শন ও মনস্তত্ত্ব। পাঠান্তরচর্চা মানেই তা হল লেখকের আত্মসমালোচনার পরিচয়লাভ করা। যে-মুহূর্তে কোনো একটি রচনা লেখার কাজ নিঃশেষ হয় সেই মুহূর্তেই লেখকসত্ত্বার অবলুপ্তি ঘটে। পরক্ষণেই যখন সেই রচনা তিনি পাঠ করেন তখন আর তিনি লেখক নন, তিনি তখন একজন সাধারণ পাঠক। তিনি তাঁরই লেখা পড়ছেন একজন পাঠকের আসনে বসে। তাই তিনি সমস্তকিছু সমালোচনা করতে পারেন পছন্দ অপছন্দ বুঝতে পারেন এমনকি ভালো লাগা বা না লাগার দিকটিও ভাবতে পারেন। সুতরাং একজন সচেতন লেখকমাত্রই হয়ে ওঠেন সচেতন ও সুচেতন পাঠক ও সমালোচক। একজন গবেষক যখন সেই রচনাটি পাঠ করেন তখন শুধু রচনার রসগ্রহণ করেন না, সঙ্গে সঙ্গে একজন সমালোচকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিজনিত রসও গ্রহণ করেন। কবি নিজে কখনও কবিতার লাইন বদলে দিয়েছেন, শব্দ বদলে দিয়েছেন, কখনও ছন্দ পরিবর্তন করেছেন। কবি যখন তাঁর কবিতার এই সংশোধন ও সংযোজন করেন তখন তার বিশেষ তাৎপর্য থাকে। একজন ঔপন্যাসিক তাঁর অভিরুচি অনুসারে কাহিনি, চরিত্র ও অন্যান্য অংশের নানান পরিবর্তন করে থাকেন। সাধারণ পাঠকের আগ্রহ সবসময় নতুন সংস্করণটির প্রতিই থাকে। পুরনো সংস্করণ তার কাছে মূল্যহীন। একটি বইয়ের যখন একাধিক পাঠ এসে যায় তখন সাধারণভাবে তাদের পুরনো পাঠের প্রতি উৎসাহ বা আগ্রহ কোনোটাই থাকে না। কিন্তু কৌতূহলী পাঠক সেই চর্চা করেন। তাই পাঠ মিলিয়ে দেখে তিনি বুঝতে চান সেই সময়ের স্রষ্টার মনের গতিবিধি ঠিক কেমন ছিল !

নিতান্ত ব্যতিক্রম ছাড়া সমস্ত স্রষ্টা আপন তাগিদে রচনার পরিবর্তন ও সংশোধন করেন। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং লেখকই তাঁর সমালোচক। তাই তিনি সংশোধন করে উন্নতমানের একটি টেক্সট আমাদের উপহার দিতে সদা তৎপর। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমতো তিনি সেই রচনার পাঠ পরিবর্তন করেন। একটি মানুষের সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার বদল খুব স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া; তাই এই পাঠান্তর কোনো অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড নয়, এটা স্বাভাবিক।

৪০৫.৪.১.২ পাঠান্তরের স্বরূপ

বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় পাঠান্তর বিষয়ক চর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লেখক একটির পর একটি লেখা প্রস্তুত করেন এবং যে'টি উপযুক্ত বলে মনে করেন তাকেই প্রকাশকের কাছে পৌঁছে দেন। প্রকাশ হতে হতে লেখক অনেকসময় পাঠ পরিবর্তন করে নতুন করে প্রকাশ করত চানএ কথা চিরাচরিত সত্য বা বলা বাহুল্য চিরন্তন সত্য। তখন আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে সেই রূপান্তরিত পাঠ শিল্পীমানসের সৃষ্টি-পক্রিয়াকে বুঝতে সাহায্য করে। তাই এই ধরনের চর্চা সাহিত্যপাঠের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সুতরাং পাঠান্তরচর্চার অর্থ লেখকমনের আত্মসমালোচনার দিকটি অনুধাবন করা। রচনার মান অধিকতর উন্নততর করবার কারণেই লেখক এই পরিবর্তন করে থাকেন। প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা' গ্রন্থে বলেছেন, "কীট্‌সের 'এণ্ডাইমিওন' কাব্যের প্রথম ছত্রটি A thing of beauty is a joy ever, কিন্তু খসড়ায় ছত্রটি ছিল A thing of beauty is a constant joy; দু'য়ের মধ্যে অর্থগত প্রভেদ নাই, শব্দগত প্রভেদও যৎসামান্য, a joy for ever-এর স্থানে a constant joy, কিন্তু ঐ সামান্য প্রভেদই রসের দুস্তর তারতম্য ঘটিয়াছে, একটি বাণীর অমর মুদ্রাঙ্কমণ্ডিত, অপরটি কবির একটি ধারণার বিবৃতি মাত্র।"

পাঠান্তচরর্চার প্রধানদুটি বিষয়ের উপর আমাদের জোর থাকেএক, প্রথম ও প্রকৃত পাঠটি উদ্ধার করা, আর দ্বিতীয় কাজটি হল স্রষ্টার পাঠপরির্তনের সম্ভাব্য বা সঠিক কারণগুলি কী হতে পারে তার একটি যুক্তসঙ্গত অনুমান। পাঠান্তর বলতে প্রধানত বোঝায় কোনো একটি টেক্সটের মধ্যে অবস্থিত শব্দ, বাক্য, স্তবক-বিন্যাস প্রভৃতির পরিবর্তন; কিন্তু বৃহত্তর অর্থে সংরূপের পরিবর্তনকেও পাঠান্তর বলা যেতে পারে, যেমন 'তাসের দেশ', 'শ্যামা'র মতো নাটক। বঙ্কিমচন্দ্রও পাঠ পরিবর্তনে সচেতন শিল্পী ছিলেন। তাই পত্রিকায় প্রকাশে ও প্রথম প্রকাশে বঙ্কিমরচনা এতো বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। তিনি 'বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বলেছেন, 'যাহা লিখিবেন তাহ হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস দুই একবৎসর ফেলিয়া রাখিয়া, আরপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।'

৪০৫.৪.১.৩ রবীন্দ্র-কবিতার পাঠান্তর

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবির কবি। তাঁর কবিতায় শিল্পনৈপুণ্যের দেখা মেলে সর্বত্রই। তিনি ছিলেন চির-অতৃপ্ত কবি। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল মন তাঁকে ধাবিত করেছে সারাজীবন। গদ্য-প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটোগল্প প্রভৃতি তিনি একবার লিখেই ক্ষান্ত থাকতে পারেননি। বারবার তার বদল করে সৃষ্টির জগতে নতুনভাবে তাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। সম্পূর্ণভাবে একটি কাজ শেষ করেই তাঁর চিত্তকে অস্থির করে সেই ভাবনা। ফলে জন্ম নিতে থাকে নতুন নতুন পাঠ। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের কয়েকটি কবিতা অবলম্বনে আমরা পাঠান্তরের বিষয়টি বুঝে নিতে পারি। এই কাব্যের কবিয়াগুলি শ্রাবণ ১৩৩৮ সাল থেকে ফাল্গুন ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে শান্তিনিকেতন, কলকাতা, বরানগর প্রভৃতি স্থান থেকে রচিত। অধিকাংশ কবিতাই তিন মাসে লেখা; কিন্তু পরে তিনি অনেক পরিবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম নির্বাচিত গদ্যকাব্য 'পুনশ্চ' (১৯৩২)। এই কাব্যের ৫০

টি কবিতার মধ্যে ৩৯ টি কবিতার পাঠান্তর আছে। কবিতাগুলি পাণ্ডুলিপি থেকে সাময়িকপত্রে প্রকাশের সময় বা পুনরায় সাময়িকপত্র থেকে কাব্যে অন্তর্ভুক্তির সময় কিংবা পাণ্ডুলিপি থেকে সরাসরি কাব্যে প্রকাশকালে নানানভাবে পাঠান্তর দেখা গেছে।

'ছেলেটা' কবিতাটি 'পরিচয়', কার্তিক ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি গল্পধর্মী। 'পরিচয়'-এ প্রকাশের সময় বেশ কিছু অংশ কবি সংযোজন করেন কখনও ভাবের প্রসারতাকে বৃদ্ধি করার জন্যে কোথাও বা অনির্দিষ্ট ভাবকে পূর্ণতা দিতেই। এখানে কবি যেন ছেলেটার মধ্যে দিয়ে নিজের কৈশোরকে পুনর্বার স্মরণ করেছেন। তাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবি যেন নিজেকে ধরা দিয়েছেন।

'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশের সময় ছিল—

পরের ঘরে মানুষ হয়েছে,

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে (এম এস ২৯) ছিল-

পরের ঘরে ও মানুশ হয়েছে।

পরিচয়, পৃষ্ঠা ২৮৩, ছত্র ৯,

কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে,

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-

মাড়িয়ে দেয় গোরুতে।

পরিচয়, পৃষ্ঠা ২৮৩, ছত্র ১২,

পাতা হয় চিকন সবুজ।

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-

পাতাগুলো চিকন সবুজ।

পরিচয়, পৃষ্ঠা ২৮৩, ছত্র ১৪,

হাড় ভাঙে,

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-

মাথা ভাঙে, হাড় ভাঙে,

পরিচয়, পৃষ্ঠা ২৮৩, ছত্র ২৩,

ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়।

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-

ছাড়া পেলেই তখনি দেয় দৌড়।

পরিচয়, পৃষ্ঠা ২৮৩, ছত্র ২৯-৩০,

বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে।

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-

বাঁশের উপর বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তুলচে;-
স্বচ্ছ জলে দেখা যায় মাছের খেলা।

'ক্যামেলিয়া' প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা', কার্তিক ১৩৩৯ সালে।

'বিচিত্রা' পত্রিকায়, কার্তিক ১৩৩৯, পৃষ্ঠা ৪৪৪, ছত্র ১, ছিল—

নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মত একঘেয়ে আওয়াজ করে,

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে (এম এস ৫৫) ছিল-

নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মত মকমক করে,

বিচিত্রা, পৃষ্ঠা ৪৪৪, ছত্র ১৫-১৬,

হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার সে তাকালো কটমট করে,
আর কিছু বললে না, এক লাফে নেমে গেল।

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-

হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার তাকালো কটমট করে।
কিছু বললে না, একলাফে নেমে গেল।

বিচিত্রা, পৃষ্ঠা ৪৪৫, ছত্র ৮,

বীরত্বের স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলি আজ আওয়াজ করচে

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-

বীরত্বের স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলি আজ মকমক করে ডাকচে।

'সাধারণ মেয়ে' প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী', কার্তিক ১৩৩৯ সালে। কবিতাটি মালতী নামের একটি মেয়ের জবানীতে প্রেমে ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মানবসত্তার মহানবোধের কবিতা এইটি। সে সাধারণ হয়েও যেন অসাধারণ হয়ে ওঠে। কাহিনিধর্মী কবিতাটি কাব্যগ্রন্থে অন্তির্ভুক্তির সময় অনেক কিছু পরিবর্তন করে দিয়েছেন

১ম স্তবকে আছে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,--

চিনবে না আমাকে।

তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েচি, শরৎবাবু,

"বাসি ফুলের মালা।"

তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।

পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি,

দেখ্‌লেম, তুমি মহদাশয় বটে,

জিতিয়ে দিলে তাকে।

শরৎচন্দ্রের 'বাসিফুলের মালা' গল্পের নায়িকা এলোকেশীর প্রসঙ্গ আছে এখানে; কিন্তু কবি পরে যোগ করলেন দুটি লাইন

দেখ্‌লেম, তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।

'প্রবাসী' পত্রিকায় ছিল—

চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েচি, শরৎবাবু

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে (এম এস ১২) ছিল—

তুমি আমাকে চিনবে না।
আমি তোমার শেষ গল্পের বই পড়েচি।

প্রবাসী, পৃষ্ঠা ১, ছত্র ১১,

পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি,

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-

পঁচিশ বছরের ভান করেছে সে প্রাণপণে।

প্রবাসী, পৃষ্ঠা ১, ছত্র ১২-১৩,

দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।

এই দুটি ছত্র পাণ্ডুলিপিতে নেই।

প্রবাসী, পৃষ্ঠা ১, ছত্র ১৫,

বয়স আমার অল্প।
স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-
আমার বয়স অল্প,-
কিন্তু এ খবরটার দাম নিজের কাছে নয়।
প্রবাসী, পৃষ্ঠা ১, ছত্র ১৬-২১,
একজনের মন ছুঁয়েছিল
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

'তীর্থযাত্রী' প্রকাশিত হয় 'পরিচয়', মাঘ ১৩৩৯ সালে।
'প্রবাসী' পত্রিকায় ছিল

কনকনে ঠাণ্ডায় হোলো আমাদের যাত্রা,
....
আর-একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।
স্থলে সৌরিন্দ্রনাথ দত্ত সংগ্রহতে ছিল-
শীত রুক্ষ্ম আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণ দূর দেশের দিকে।
অত দীর্ঘ ভ্রমণের সময় এ তো নয় একেবারেই।
পথ দুর্গম, বাতাস ক্ষুরের মতো শান দেওয়া
কনকনে শীত।
উঠগলো হয়রান, পায়ে ক্ষত, বিরক্ত বিমুখ তারা,
গলে-পড়া বরফে শুয়ে শুয়ে পড়ে।
তার উপরে মনটা যাচ্ছে বিগড়ে
যতই দেখছি পাহাড়তলীর আরামঘর আর চাতালগুলো,
আর রেশমি কাপড় পরা যুবতীর দল পেয়ালা হাতে।
তার উপরে উঠওয়ালারা গাল দেয়,
গুমরে গুমরে ওঠে রাগে,
কোথায় পালিয়ে যায় মদ আর নারীর অভাবে
ক্ষেপে উঠে।

মশালের আলো নিভে যায়,
মাথা রাখবার ঠাঁই জোটে না।
যত চলি, নগরে নগরে কেবল বৈরিতা,
পথে পথে সন্দেহ,
গ্রামগুলো যঘন্য নোংরা,
তুচ্ছ জিনিষের দাম হাঁকে অসম্ভব।
যাত্রা হোলো রূঢ় নিদারুণ।
অবশেষে স্থির হোলো
রাত্রেও চলতে হবে
মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে,-
এই দিব্যবানী বাজবে তখন কানে কানে
এ সব মিথ্যা ওরে এ সবই মোহ।
তারপরে প্রভাতে আমরা
পাহাড়ের এক খদে এলুম,
বরফ সীমার নীচে
সেখানে শীত কম;
ভিজে হাওয়া আবাদের গন্ধ বয়ে আনে,
খরস্রোত নদী আর জলযন্ত্রের চাকা
আঁধারকে মারে চাপড়।

'শিশুতীর্থ' প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা', ভাদ্র ১৩৩৮ সালে। পত্রিকায় প্রকাশকালে কবি নাম দিয়েছিলেন 'সনাতনম এনম আহুর উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ' ; পরে কাব্যগ্রন্থে প্রকাশকালে নাম দেন 'শিশুতীর্থ'। কবিতাটি সম্ভবত কবির শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে একটি। কবিতাটি এলিয়টের ''The Journey of the Magi" কবিতার অনুবাদ হলেও কবিভাবনার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। পশুশক্তি যে সাধুকে হত্যা করলো, সেই সাধুর মাথাতেই প্রভাত সূর্য্যের রেণু ঝরে পড়লো-

হঠাৎ সকলে স্তব্ধ;
সূর্য্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্তি ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল,পুরুষেরা মুখ ঢাক দুই-হাতে
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, কে আমাদের পথ দেখাবে,

পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে,
আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।

এই অংশটির পাণ্ডুলিপির পাঠ ছিল

হঠাৎ সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল,
দেখতে পেলে মৃতদেহ ধূলায় পড়ে।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকলো দুই-হাতে
কেউ কেউ অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না,
পরস্পরকে তারা শুধায়,কে আমাদের পথ দেখাবে।
পূর্বদেশ থেকে প্রাচীন লোক এসেছে সে বললে, "আমরা
যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।"
নিরুত্তর হয়ে সবাই বসে রইল।

প্রলিত পাঠে এসেছে বক্তব্যের প্রত্যক্ষতা। অমানবিক শক্তিকে যারা শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নিয়েছিল সেই ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গেল।

বিচিত্রা, পৃষ্ঠা ১৪৩, ছত্র ১৪,

দিগন্তে একটা আগ্নেও উগ্রতা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে;

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-

দিগন্তে একটা আগ্নেও আভা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে;

বিচিত্রা, পৃষ্ঠা ১৪৩, ছত্র ১৬,

ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা?

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-

কিম্বা কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।

বিচিত্রা, পৃষ্ঠা ১৪৪, ছত্র ১,

অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হ'তে

স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ছিল-

অকস্মাৎ নানা কলরব বিচিত্র স্বরে আকাশে উঠে আলোড়িত হতে

'পুকুর ধারে' প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা', আশ্বিন ১৩৩৯ সালে।

জলে গাছের গভীর ছায়া টলটল করচে

স্থলে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৩৯) ছিল-

জলে গাছের গভীর ছায়া টলমল করচে

প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৮, ছত্র ৪,

চেয়ে দেখি আর মনে হয়

স্থলে ছিল-

চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে হয়

প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৮, ছত্র ১১,

দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েচে

স্থলে ছিল-

দুটি পা ঘিরে বেঁকে পড়েছে

দোতলার জানলা থেকে

৪০৫.৪.১.৪ রবীন্দ্র-উপন্যাসের পাঠান্তর

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১৩০৯-এর কার্তিক মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে। এর পর ১৩০৯ সালের (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) পুস্তককারে প্রকাশিত হয়। কবির জীবৎকালে শেষ সংস্করণ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালের শেষ সংস্করণের সঙ্গে প্রথম সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে দেখা যেতে পারে কতখানি পাঠান্তর ঘটেছিল !

'চোখের বালি' উপন্যাসটি পত্রিকায় প্রকাশের সময় অর্থাৎ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ছিল 'বৌ লইয়া ঘর করিবার সময় আসিয়াছে,।' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর হয়েছে'এখন মার আঁচল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকন্না করিবার সময় আসিয়াছে,...।' এই 'কন্না' শব্দযোগে লেখক বক্তার চরিত্রকে আরও পরিস্ফুট করেছেন বলেই আমাদের মনে হয়। তার পরের বাক্যটিতে আছে, 'এমন ছোটো ছেলের মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বোধ হয়।' রাজলক্ষ্মী ও মেজোবউ দুজনেই এই কথা মর্ম বুঝেছেন।

সেই পৃষ্ঠায় একটি দৃষ্টান্ত, 'এবং ইহাই তাহার জানা ছিল' পত্রিকায় প্রকাশকালে এই রকম কথা ছিল পরে তা বদলে গিয়ে হয়, 'এবং ইহাও তাহার জানা ছিল,...।' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় দেখা গেলমহেন্দ্র কলেজ থেকে সকাল সকাল ফিরে কাকীর ঘরে ঘরে গেল এবং কাকীর একটি পিতৃমাতৃহীনা বোনঝি আছে, এবং মহেন্দ্রের সঙ্গে

তার বিয়ে দিয়ে বিধবা কাকী কোনো সূত্রে নিজের ভগিনীর মেয়েটিকে কাছে এনে দুবেলা দেখে সুখী দেখতে চান। এই বিষয়টি এই পাঠান্তরে ধরা পড়েছে। শুরুতে 'ইহাই' তা বদলে দিয়ে করলেন 'ইহাও'। নির্দিষ্ট একটি বিষয়কেই গুরুত্ব নয় আরও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এইটি একটি।

'গোরা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায়। রচনাটি ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস থেকে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'গোরা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯ শে মাঘ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ঐ বছরেই এবং এই সংস্করণে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের অনেক পাঠ বর্জিত হয়েছে। ১৩৩৪ সালে 'গোরা'র বিশ্বভারতী সংস্করণে অনেক অংশ পুনরায় গৃহীত হয়। ১৩৪৭ সালে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে পত্রিকায় প্রকাশিত বর্জিত পাঠের বহু অংশ পুনঃসংযোজিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসটি ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় (পৃ ১৭৮) উপন্যাসটি প্রকাশের সময় যা ছিল তা নিম্নরূপ—

গোরা — ১। শ্রাবণ মাসের সকাল বেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্ম্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে, কালেজে, আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ তরকারীর চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁয়া উঠিয়াছে— কিন্তু তবু এত বড় এই যে কাজের সহর কঠিনহৃদয় কলিকাতা— ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোলার আলোকের সাময়িক পত্রে প্রকাশকালে পৃষ্ঠা ১, ছত্র ১-এ ছিল 'শ্রাবণ মাসের সকাল বেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়ে নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে।' কথাগুলির পর ছিল 'রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার বিরাম নাই, ...অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।' এই কথাগুলি প্রবাসীর মুদ্রিত পাঠে ছিল। পরে ১ম সংস্করণে বাদ যায় এবং পরে তা আবার যুক্ত হয়।

৪০৫.৪.১.৫ উপসংহার

কোনো গ্রন্থের পাঠান্তর এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যেখন থেকে মনে হতে পারে গ্রন্থটি নতুন। শুধু কলেবরে নয় ভাবনা মননে ও সাধনায় পরিবর্তন এসে যায়। যে-কোনো সৃষ্টির পরে তাকে নতুনরূপ দিতে চাওয়াএটি একটি শিল্প প্রকৌশলের বিষয়। আমরা ইতিমধ্যে বুঝে গেছি যে-কোনো পাঠপরিবর্তন হল আত্মসমালোচনার অন্তর্গত বিষয়। এই বিষয়টি একজন স্রষ্টার পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও আবশ্যিক একটি বিষয়। একজন সাহিত্যস্রষ্টা যখন নিজের কাজে নিজে সন্তুষ্ট হতে পারেন না তখন তিনি সর্বপ্রথম সমালোচকের আসনে বসে পাঠকের নতুনপাঠের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার ভঙ্গিতে সংশোধন সংযোজন ও পরিমার্জন করে চলেন নিরন্তর। অনেকসময় সাময়িকপত্রে প্রকাশে একরকম টেক্সট কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকশের সময় বহু স্থান বদলে যায়। এই পরিবর্তনটি আমাদের মতো পাঠকের পক্ষে ভীষণ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। নিজের লেখার ভালো বা মন্দ বিচার করার ভার যখন নিজের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে তখন তা খুব কঠিন কাজ হয়ে ওঠে নিমেষেই। নিজের লেখা পড়তে গিয়ে ভুল খুঁজে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। তাই নিজের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে এই পরিসরগুলি নজর করা সম্ভব। পাঠান্তর পর্যালোনার কাজের প্রধান বিন্দু হল স্রষ্টার এই আসনপরিবর্তনের শিল্পগত কৌশলটি বোধগম্য করে তোলা। কবি বা লেখক

যখন লিখছেন তখন কচ্ছপের কামড়জনিত একটি তাড়না থাকে, কিন্তু পরক্ষণেই তা আর থাকে না তখন একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে সাবলীলভাবে পড়তে গিয়ে বহুবিধ সংশোধন প্রয়োজন হয়।

৪০৫.৪.১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও সুচিত্রা পাল (সংকলিত) পাঠান্তর চয়ন সমগ্র রবীন্দ্র— উপন্যাস

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সংকলিত) পাঠান্তর চয়ন— রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী— রবীন্দ্র উপন্যাসের পাঠান্তর ও শিল্পবিচার

জয়শ্রী মুখার্জী— রবীন্দ্রনাথের অন্তিমপর্বের সাহিত্য পাঠান্তর সমীক্ষা

শঙ্খ ঘোষ— নির্মাণ আর সৃষ্টি

প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা

৪০৫.৪.১.৭ নমুনা প্রশ্ন

ক) পাঠান্তর বল কী বোঝ? রবীন্দ্রকাব্য জগতের পাঠান্তরের দুএকটি দৃষ্টান্ত দাও।

খ) রবীন্দ্র উপন্যাসে পাঠান্তর হয়েছে এমন কয়েকটি স্থানের কথা উল্লেখ করে সংক্ষপে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।